কৃষক-কৃষাণীর রোজমানচা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

" বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সবার জন্যই একটি স্বর্ণালী অধ্যায়। তারুণ্যে ভরপুর সেই দিনগুলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সমস্ত জীবনে এত সুন্দর সময় আর আসবে না। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। আনন্দ, উল্লাস, উচ্ছলতা ভরা ছিল সেই দিনগুলো; সেই সাথে ছিল অকারণ অভিমান, তীব্র কষ্ট, বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া বিকেল-সন্ধ্যা, নির্ঘুম রাতের নীরব কান্না; তারপরও, আহা আমার সোনার খাঁচার দিনগুলি। অনেক প্রাপ্তি ছিল, ছিল না পাওয়ার কষ্ট। এই বুঝি জীবন, জীবনের সহজ এবং কঠিন সমীকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বছর আমাকে পূর্ণ করেছে, আলোকিত করেছে, পরিণত করেছে। যাকে পাথেয় করে আজকের আমি পথ চলছি ...

আমার এই পথ চলা এত মধুর, এত পূর্ণ কখনোই হতো না, যদি না আমার জীবনে তার আগমন ঘটতো। কার? পাঠকের চিরচেনা সেই কৃষক এর। এত বছর পর এই লেখার সুবাদে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে রাখি। ও ছিল বলেই আমি জারুল, রাধাচূড়া, চালতা গাছ চিনেছি, চিনেছি নাম না জানা আরো কত ফুল পাখি।

প্রতিটি কাজে সে ছিল আমার সাথী, তাই আমার যা কিছু প্রাপ্তি তাতে তাঁর অবদান অনেক অনেকখানি ... "

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৬ ই জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৪:১৪

আজকে আমার খুশী হইবার কথা কিন্তু হইতে পারছি না

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার একটি মেয়ের খুব প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। খুবই গাঢ় সম্পর্ক। দুই পরিবারের সবাই ব্যপারটা মেনে নেয়। কিন্তু সম্পর্কটা টিকে নাই। দোষটা মনে করি আমারই ছিল বেশী। কারণটা আরেক দিন বলবো।

হঠাৎ ইন্টারনেটে ঘুরতে ঘুরতে ১৫ বৎসর পর ফেইসবুকে দেখি তার প্রোফাইল। আমি টাশকি খাইয়া বইসা রইলাম অনেকক্ষন। তারে নক করলাম। সে ফ্রেন্ড হিসাবে এড করল। তারে জিজ্ঞাসা করলাম

: কেমন আছ?
: ভাল আছি।
: আমি তোমাদের সাথে পড়তাম
: অমুক অমুক এখন কোথায় আছে?
সে সব উত্তর দিল

আবার জিগাইলাম
: বিয়া তো অনেক আগেই করছো যেহেতু মেয়ের বয়স ৪ বৎসর। তোমার স্বামী কি করে?
: বিয়ে করছিলাম ১৯... । এইডা ভাল ম্যাচ ছিল না। দীর্ঘ তিন বছর পৃথক থাকার পর অল্প কিছুদিন আগে ডিভোর্স হইছে।

আবার টাশকি খাইয়া বইয়া রইলাম। ভাবলাম এইডা কি হইল। না জিগানো তো ভালো ছিল। ভাবলাম আমার তো খুশি হইবার কথা। বলা উচিৎ উপযুক্ত শিক্ষা হইছে। কিন্তু কেন জানি খুশি হইবার পারলাম না।

তার প্রোফাইলের ছবি গুলা দেইখা তারে কইলাম

: ছবি গুলার মধ্যে মনে হয় আমি একজনরে চিনছি তোমার দুলাভাই (তোমার অমুক বোনের স্বামী)
: তুমি আমার বোনের নাম জানলা কেমনে?
: একসাথে পড়ছি জানমুনা।

তার পর থাইকা আর কিছু বলে না।

মনে হয় চিইনা ফালাইছে। তার বোন /দুলাভাই আমার একবার তাদের বাসায় ডাইকা নিয়া জামাই হিসাবে ইন্টারভিউ নিছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাড়া মনে হয় আর কেউ তাগরে চিনবার পারবো না।

এই বিশ্ব বড়ই অদ্ভুত।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৭ ই জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৩:২১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম -বিষবৃক্ষের বীজ বপন (১)

অনেক অনেক আগের কথা। খুব স্পষ্টভাবে মনেও নেই। স্মৃতির উপর ভরসা করে লেখা।

আমি তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। উচ্ছল প্রানবন্ত এক সদ্য গোঁফ উঠা যুবক। হলে এলাম, এক রুমে তিনজন একই ফ্যাকাল্টির এবং একই ইয়ারের। ক্লাস শুরু হলো। অনেক বন্ধু বান্ধব জুটে গেল। নতুন নতুন বন্ধু বান্ধবী নিয়ে সময়টা স্বপ্নের মতো কেটে যেতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হয়েছি প্রেম করতে হবে, যৌবনের পাগলা ঘোড়াকে বশীভুত করে কোন বন্ধনে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করা, এমন একটা ধারনা থেকেই আমার প্রেমের পথে অগ্রযাত্রা।

বিষবৃক্ষের বীজ বপনঃ

ক্লাসের পর লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে হবে এই ধারনায় যথারীতি ক্লাসে যত এসাইন্টমেন্ট দেওয়া হইত তা লাইব্রেরীতেই সম্পাদন করতে লাগলাম। একদিন আমাদের ক্লাসের এক মেয়ে আমাকে বললো তুমি লাইব্রেরীতে কি কর? আমি কইলাম যে এসাইন্টমেন্টটা দিছে তা এখন কইরা ফালামু তুমি করতে চাইলে আইতে পার।এইখানে বইলা রাখি, আমাদের পুরা ক্লাসে মাত্র তিনজন মেয়ে। আমাদের সাবজেক্টটা তে সাধারনতঃ মেয়েরা কম ভর্তি হতো। মেয়ে ক্লাসমেট দের সাথে আমার সক্ষ্যতা বেশ ভাল ছিল । তারা সবাই আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল।

সে আমার তখনই আমার সাথে লাইব্রেরীতে এলো, আমরা মানে আমি আর সে একসাথে এসাইন্টমেন্টটা সম্পন্ন করলাম। সে কইল আমরা তো এইভাবে প্রতিটা এসাইন্টমেন্ট কইরা ফালাইতে পারি। আমি কইলাম নো প্রোবলেম (ব্যাক্কল আমি বুঝি নাই, নিজের ভিতরের পুলকের অনুভুতি তখন খুব ভালা লাগতাছিল।) । যথারীতি আমরা তারপর থেকে একসাথে এসাইন্টমেন্ট গুলা সম্পন্ন করতে লাগলাম। আমি না বুঝলে সে বুঝাইতো আর সে না বুঝলে আমি বুঝাইয়া দিতাম । আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। মেয়ে বন্ধু লইয়া ঘুরাঘুড়ি করি, বন্ধুদের ইর্ষা উপভোগ করি। যদি কেউ কয় এইডা আমার মানসিকতার দোষ তাইলে তাই সই। আমি কই বিষবৃক্ষের বীজ এইখানেই বপিত হইয়াছে।

এমন হইয়া গেল প্রতিদিন ৩-৪ঘন্টা একসাথে আমরা লাইব্রেরীতে এক টেবিলে পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ের উপর পড়ালেখা করি। তার ফাকে ফাকে তারে কাছ থাইকা দেখি। কলম ধরার ষ্টাইল দেখি। পড়ার ষ্টাইল দেখি । তার চুল দেখি। তার নাক দেখি। তার চিন্তিত মুখ দেখি। তার বিষন্ন মুখ দেখি। উল্লাসিত চেহারাও দেখি। প্রতিটা ভঙ্গিমা আমার কাছে পরিচিত হইয়া উঠিল। আমরা বন্ধু। তাহার প্রতি আমার কোন ভালোবাসা তখনও জন্মাইয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বিভিন্ন হাসি কৌতুকে অন্যান্য আলোচনায় নিজেরা এবং অন্যান্যরা মাতিয়া থাকি। বিকাল বেলা নদীর পারে ঘুরতে যাওয়া। বিকালের নাস্তা একসাথে করা। এইসব কেমন কইরা যেন প্রাত্যহিক জীবনের এক রুটিন ওয়ার্ক হইয়া দাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্লাস পরীক্ষার প্রস্তুতি। ইত্যাদি বিষয়ে দেখি সে আমার পরামর্শ চায়। আমি কই বাহ বাহ নিজেরে একটু মূল্যবান মূল্যবান মনে হইতেছে। পুলকিত হই।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৯ শে জুলাই, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬:৩৭

বিশ্ববিদ্যালেয়র প্রেম - বিষবৃক্ষের বীজে পানি ঢালা শুরু

দিন কাটে ভালো ভাবেই। সকাল বেলা উঠিয়া ক্লাসে যাওয়া। ১২টার মধ্যে ক্লাস শেষ। কোন কোন দিন ব্যবহারিক ক্লাস থাকে। ব্যাবহারিক ক্লাসের প্রথম দিন স্যার বললো তোমরা ২জন কইরা গ্রুপ করো । সে এবং আমার রোল পাশাপাশি হওয়ার কারনে এক গ্রুপ হইয়া গেলাম। আহা ভাবি কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। তিন জন মেয়ের মধ্যে একজন আমার ভাগ্যে। আর এক মুন্সী হুজুর আছিল আমাগো ক্লাসে, সেও পরলো এক মাইয়ার সাথে। সাথে সাথে স্যারেরে গিয়া কয় আমি মাইয়ার সাথে গ্রুপ করুম না। স্যার কিছুক্ষন তার দিকে চাইয়া থাইকা কইল আচ্ছা তোমরা দুইজন মাইয়া এক গ্রুপ কইরা ফালাও। বাহ বাহ আমার মনে মনে আনন্দ দেখে কে? আমার গ্রুপমেটের দিকে আড়চোখে চাইয়া দেখি তার কোন ভাবান্তর হইল কিনা? না মনে হয় হয় নাই।

রোল পাশাপাশি হইবার কারণে এসাইন্টমেন্ট, ব্যবহারিক, লাইব্রেরী থাইকা বই (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার বই কিনতে হইতো না। টেকস্ট বইগুলা ২জনরে একটা কইরা বই ১ বছরের লাইগা দিত) সেইখানেও এক গ্রুপ। লাগছে গিট্টু । মনে মনে কই এই গিট্টু ছাড়াইবার সাধ্য কার আছে? কিন্তু উপরওয়ালা কয় রাখ তোরে দেখতাছি।

লাইব্রেরীতে একসাথে এসাইন্টমেন্ট করি, এমনকি ক্লাসের পড়াগুলাও দুইজনে লাইব্রেরীতে শিইখা ফালাই। বাহ এইতো ভালো ছাত্রের উত্তম নমুনা। ক্লাসে ফাকি নাই। পড়া জিগাইলে সাথে সাথে উত্তর দেওনের চেষ্টা।

কিন্তু পড়ার ফাকে ফাকে তার দিকে নজরতো আমার ঠিকই যায়। তারে খুব ভালো ভাবে দেখি। আগে তার চোখ নাক চুল এইসব দেখতাম। এখন তার সাথে যোগ হইলো ভাললাগার মাত্রা। চুল দেইখা কই বাহ বাহ কি সুন্দর তার ঘন কালো রেশমী চুল। ঠিক কোমড় পর্যন্ত আসিয়া পড়ছে। এর থাইকা ভালো চুল আমি আর দেখি নাই। নিজের প্রশ্ন করি - ওই তুই কি দেখছস। আমার মন আবার উত্তর দেয় - না, দেখি নাই। কই বাহ বাহ কি সুন্দর চুল যেন কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতো। সাথে সাথে আবার তার চুলের দিকে চাইয়া আমার কথার সত্যতা খুজি। সাথে সাথে পাইয়াও যাই । আহা কি সুন্দর একটা গুরুগম্ভীর ভাব আছে মনে হইতেছে যেন এখনই ঝুম কইরা বর্ষন শুরু হইয়া যাইবো। বর্ষনের কথা মনে হইতেই হঠাৎ সঞ্চিত ফিরিয়া পাই তার ডাকে, জিগায় কি ভাবতাছ। কি ভাবতাছি তারে কেমনে কমু কি ভাবতাছি। কই কিছু একটা তো ভাবতাছি, বাড়ীর কথা।

কইলাম এখনতো বিকাল হইয়া গেছে। নদীর পাড়ে বেড়াইতে যাবা। সে কয় চলো যাই। আমি সারাজীবন বয়েজ স্কুল কলেজে পড়ালেখা করছি এইডা জিগাইয়া ভাবতাছিলাম কিছু আবার মনে করলো নাকি? তার উত্তর শুইনা তো মন ভালো হইয়া গেল। বললাম চলো যাই। এই প্রথম তারে লইয়া নদীর পাড়ে গেলাম ।

এইখানেই বিষবৃক্ষের বীজে পানি ঢালা শুরু হইলো

বুক খানা ফুলাইয়া তারে লইয়া নদীর পাড়ে বিকেল আলোতে ঘুরি আর ভাবি আমি মনে হয় বিশ্ব জয় কইরা ফালাইছি। আহা কি শান্তি। নদীর পাড়ে আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন। তারে কইলাম চলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাই। সেও কয় চলো তারে লইয়া ঢুকলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। নদীর পাড়ে বসার জন্য অনেকগুলা বেঞ্চ বানাইয়া রাখছে আমাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার একটা বইলাম তারে কইলাম বসো । সে বিনা সঙ্কোচে আমার পাশে বসলো। দুইজন মিইলা তাকাইয়া রইলাম নদীর পানি দিকে ।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২০ শে জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৩:০৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - যারে ভালোবাসিয়া ছিলাম

নদীর দিকে চেয়ে থেকে তার সঙ্গে বিভিন্য আলাপ। যার কোন মাথা মুন্ডু নাই। বলা যায় কোন অর্থ নেই। বোটানিক্যাল গার্ডেন হইতে সন্ধ্যার পর পর ফিরে আসা। আবার সেই আগের রুটিন। দেখতে দেখতে মাসখেনেক চলে গেল। একদিন সে বললো আমি বাড়ী যাবো। আমি কইলাম যাও। আমারে কইলো আমারে একটু বাসে তুইলা দিবা। আমি তারে গিয়া বাসে তুইলা দিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি কেমন জানি ফাকা ফাকা লাগে। ক্লাস করতে যাই, দেখি একজন নাই। সবাই আছে তারপরও যেন কেউ নাই। মনে মনে নিজের শাসন করি তোর কপালে খারাপি আছে।

পরদিন এক কাছের বন্ধুরে (আমার রুমমেট) কই চল বোটানিক্যাল গার্ডেন থাইকা ঘুইরা আসি। আমি আর সে ঢুকলাম গার্ডেনে। ঢুইকাই একটা ফুলের গন্ধ পাইয়া বন্ধুটা উচ্ছাসিত হইয়া কয় কাঠালিচাঁপা ফুল ফুটছে। কিন্তু আমার কাছে গন্ধটা পরিচিত পরিচিত লাগতাছে। অথচ আমি কাঠালি চাপা ফুল আগে দেখি নাই। সে আমারে গাছের কাছে নিয়া গেল। দেখি গন্ধ আছে কিন্তু ফুল দেখা যায় না। তাজ্জব ব্যাপার। ঝাকড়া গাছে সারাটাই পাতা আর পাতা। আমরা দুইজন বহু কষ্ট কইরা ফুল বাইর করলাম। কাঠালি চাপার গন্ধ কঠিন গন্ধ। হঠাৎ মনে হইল আরে তার চুল থাইক তো আমি এই গন্ধ পাই। বাহ বাহ এ যে একে বারে সাহিত্য। পরে অবশ্য শুনছিলাম এইটা KAO নামে একটা শ্যাম্পুর কারসাজি। বড় ব্যাথা পাইছিলাম মনে । মনে হইছিল না হইলেই তো ভালো হইতো।

যাক। সে দুইদিন পরে ফিরা আইলো। পরদিন যখন আমরা লাইব্রেরীতে যাই সে কইলো পরদিন আমারে খাওয়াইবো কারণ বাড়ী থাইকা মাসের খরচ নিয়া আইছে। আমি কইলাম কই খাওয়াইবা। কারণ শহর আমাদের ইউনিভাসিটি থাইকা ৪ কিমি দূরে। সে কইলো শহরে। মনে মনে আমিও তাই চাইতেছিলাম ভাবছিলাম যদি এক রিক্সায় এই ৮ কিমি (আসা যাওয়া - প্রায় ১:৩০ঘন্টা)। বাহ বাহ । কোন মতে রাত কটাইয়া সকাল হওয়া পর তো আর সময় কাটে না। যাক আসলো সেই সময় । আমরা হইছি দুইজন, যামু রিক্সায়। যাক ঠিক করলাম রিক্সা, সে দেখলাম নিসংকোচে আমার পাশে বসলো। আহা আমি আনন্দিত। এইটাই আমার তার সাথে প্রথম রিক্সা ভ্রমন।

ধীরে ধীরে যত দিন যায় আগে পুলকিত আনন্দিত হইলেও এখন মনের এই লাগামহীন চলতে দেওয়া নিয়ে একপ্রকার ভয়ের সৃষ্টি হলো। মন চায় স্বপ্ন দেখতে। কিন্তু বিচার বুদ্ধি কয় বেশী লাফাইতেছ। এ এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তার মনে কথা তো আমি পড়িতে পারি না। সে সুন্দর সাবলীল ভাবে দিনাতিপাত করছে। আমি মরি দ্বিধা দ্বন্দে। এই পর্যায়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন জরুরী হইয়া পড়িল।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২১ শে জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৪:২০

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - যারে আমি ভালবাসিয়া ছিলাম

এই ভাবে দিন যায়। তার সঙ্গে এখন দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। এই আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে এইটা কোন ব্যাপার না। ইদানিং কারও কারও দৃষ্টি কিঞ্চিত তীক্ষ্ণ হয়। কিছু বলিতে পারে না পাছে আধুনিক যুগে তার মধ্যযুগীয় সংস্কার প্রাকাশ হয় এই ভয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহন করতে আসিয়া রক্ষনশীলতা বর্জন করাই বাঞ্চনীয়। আমার ও রহস্য করিতে খারাপ লাগে না। কিন্ত আমি নিজে এক রহস্যের জালে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছি। মন আমার আশা নিরাশা, ভালোলাগা ভয়, প্রাপ্তি বঞ্চনা এর দোলায় দোদুল্যমান। যারে কওয়া যায় বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

এর মধ্যে একদিন লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে তারে কইলাম চলো খিদা লাগছে কিছু খাইয়া আসি। গেলাম টিএসসি তে নাস্তা করার পর দেখি পুরা বিকাল হইয়া গেছে। সবাই ঘুরা ঘুরি করতে বাইর হইয়া গেছে। আমি কই আজকে আর লাইব্রেরীতে গিয়া কাম নাই । চলো নদী পাড়ে যাই। সে কয় চলো যাই। আমি মনে মনে কই বাহ বাহ। গেলাম নদী পাড়ে বসলাম সেই বিখ্যাত বেঞ্চ গুলার একটাতে। হঠাৎ লক্ষ্য করি নদীর পানি এতদিনের তুলনায় বাড়ছে। নিজে পুলকিত নিজের পর্যবেক্ষনে আমি, যে কিনা জীবনে নদীর পানি কেন পাশ দিয়া কে যায় তার খবরও মাঝে মাঝে জানি না সেই আমি করি নদীর পানি লইয়া পর্যবেক্ষন। তার সান্নিধ্য দেখি আমারে ভালই প্রভাবিত করছে। তারে কইলাম দেখছো নদীর পানি বাড়ছে ঐ দিনের থাইক্যা। সে কয় আমি তো লক্ষ করি নাই। কথা পৃষ্টে কথা তারে কইলাম কি লক্ষ্য করছ তাইলে। সে উত্তর দিলো আমি দেখতাছি কাশ বন। নদীর ঐ পাড়ে বিশাল কাশ বন আছিল। মনে মনে কই আরে এতো দেখি আমার চেয়ে আগে আগে যায়। কিছু দূরে চাইয়া দেখি নৌকা আছে। নৌকা গুলা বিকাল বেলায় এইখানে আইসা ভাড়া খাটে। পুলাপানরা মনে আনন্দে নৌকা ভাড়া লইয়া ঘুইরা বেড়ায়। আমি তারে কইলাম চলো কাশ বন দেইখা আসি। সে কইল কেমনে যাইবা। ঐ যে দেখ নৌকা। নৌকা ভাড়া কইরা গেলাম ঐ পাড়ে কাশ বনে। এইটাই তার সাথে আমার প্রথম নৌকা ভ্রমন। সে আমারে কয় আমি আগে আর কোন দিন কাশ বনে আসি নাই। মনে মনে একটা ভাল লাগার অনুভুতি হইল। আমি অন্তত তারে প্রথম বারের মতো কিছু একটা দেখাইতে পারছি। সে দৌড় দিয়া গিয়া কাশ ফুল ধইরা গালের কাছে নিয়া কয় দেখছ কি সাদা এই ফুল গুলা। তার এই কাশ ফুল ধরা অবস্থার ফ্রেম টা আমার মনে মধ্যে স্থায়ী ভাবে ঢুইকা গেল। এখনও যখনই কাশফুলের ছবি দেখি সেই ফ্রেমটার কথা মনে হয়। সে বিশালা উত্তেজিত, আনন্দিত। মনে মনে ভাবি এ আমি কারে দেখতাছি। তারে এতদিস কাছ থাইকা দেখছি কিন্ত তার এই রূপতো আমার চোখে ধরা পরে নাই। আমি আনন্দিত। এ এক অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম ভালোলাগা।

আমি নিশ্চিত সে তার পরে কাশ বনে গিয়া একই আনন্দ পায় নাই। তার এই আনন্দের ভাগীদার শুধুমাত্র আমি আর সেই বিকাল। আমারা কাশবনে থাকলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় তারে হলে পৌছাইয়া দিয়া ফিরা গেলাম আমার আস্তানায়। রুমে ফিরতেই রুমমেট কয় খুব তো মজা লইতাছো। আমি কইলাম মজার কি দেখলা। কইলো দেখলাম তারে লইয়া নৌকা দিয়া ঘুরতাছে। মনে হয় আমার কান কিঞ্চিত লাল হইয় গেছিল। সে আর কথা বাড়াইলো না। আমিও বাইচা গেলাম। কিন্তু ঘুম লাটে উঠলো চোখ বন্ধ করলেই সেই ফ্রেম। মন আমারে কয় এইডা কি করলি এর থাইকে তো বাইর হইতে পারবি না। বড়ই কঠিন এই পথ । আমি কই আমি তো বাহির হইতে চাই না। মন কয় বুঝবি ঠেলা। আমি কই বুঝলে বুঝমু নে তুই চুপ থাক।

আমি ঘুম লাটে তুইলা সেই বিকাল, সেই ফ্রেম ও ফ্রেমের মানুষ রে লইলা স্বপ্ন সাজাইতে বসি। .....

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২২ শে জুলাই, ২০০৮ দুপুর ২:৪২

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেম - যারে আমি ভালবাসিয়া ছিলাম (২)

স্বপ্ন সাজাতে ভালো লাগে। কিন্তু সমস্যা হইল বাস্তবে আইসা অসংখ্য বাগ ধরা পরে । প্রোগ্রামের বাগ হয়তো সারানো যায়। প্রথম থাইকা পুরা রিভাইস করলে বাগগুলা নির্মূল করা অনেকাংশেই সম্ভব। কিন্তু সময় নামক মাত্রাটির নিয়ন্ত্রন আমাদের হাতে না থাকায় বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। এ এক ওয়ান ওয়ে এন্ট্রির মতো। এইটা আমি খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারি। তাই স্বপ্ন সাজাইতে গিয়া বাগের ভয়ে স্বপ্ন আর বেশীদূর আগায় না অথবা বাগ বিহীন স্বপ্ন সাজানো আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ তার মনের কথা তো আর আমি বলেত পারি না। অন্তত এই অবস্থায় মনে হয় সময় দেই। সময় আপনা থেকে বলে দেবে কি হয়। নিজের লইয়া হইলো আরেক জ্বালা। চায় স্বপ্ন দেখতে ।

আমার অবস্থা অনেকটা এখন কিংকর্তব্যবিমুর টাইপ। দিনের রুটিনের তেমন পরিবর্তন নাই। সকালে ক্লাস দুপুর বিকাল লাইব্রেরী এই চলছে। দেখতে দেখতে এসে গেল ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আমরা নতুন। সবাইরে বলতে শুনি স্বাধীনতা দিবসে খুব সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। তবে এইবার মেলাও হবে। যথারীতি তারে কইলাম ২৬ তারিখ কি করবা? সে কইলো আমার কোন কাজ নাই। কইলাম তাইলে সকাল সকাল টি এস সি তে আইসা পইরো আমরা মেলা দেখতে যাবো। আমি মফস্বলের পুলা মেলা আমার খুব প্রিয়। ঐদিন সকাল বেলা আমি গিয়া টি এস সি তে উপস্থিত । ঘড়িতে বাজে সকাল ৭:৪৫ । অপেক্ষা করি সে আর আসে না। মনে মনে নিজেরে গালি দেই টাইমটা কি কইছিলাম। মনে তো হয় না। অপেক্ষা করতে থাকি। জানেন তো অপেক্ষার সময় বড় দীর্ঘ হয়। বুঝতে পারিনা কি করমু। হলে গিয়া তারে ডাক দিমু সেই ইচ্ছাও আবার করে না। নাকি একটু কেমন জানি লাগে। যাই হোক অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সে আসলো ১০:২০ মিঃ। আমি তারে অবাক হইয়া দেখি। এ আমি কারে দেখতাছি। এতো আমার সেই বন্ধু, ক্লাসমেট, গ্রুপমেট, লাইব্রেরীমেট না। এ অন্য কেউ। কারণ সে শাড়ী পইরা আইছে। তার দিকে অবাক হইয়া চাইয়া থাকি। চমৎকার ভাবে সাজুগুজু কইরা এ কে আমার সামনে উপস্থিত। আমি পুরা টাশকি। মাথা পুরা আউলা। তারে খুব সুন্দর লাগতাছে এই কথাটা তারে আর কইতে পারলাম না। কইলাম বসো। সে বইলো। জিগাইলাম চা খাবা। কইলো খামু। দিলাম চা এর অর্ডার। আমার অবস্থা প্রকাশ পাইছিল কিনা জানি না। চা খাওয়ার ফাঁকে সে কইলো দেখতো আমারে কেমন লাগতাছে। কইলাম খুব খুব সুন্দর লাগতাছে। প্রথমবার এই রূপে তোমারে দেখতাছি তো তাই আরও ভালো লাগতাছে। সে লজ্জা পাইয়া কইলো যাহ্। এই যাহ্ তীরের মতো আইসা বুকে বিধলো। পাছে আবার কিছু মনে করে তাড়াতাড়ি কইলাম চলো মেলায় যাই।

দুইজনে গেলাম মেলায়। আহা আমি আনন্দিত, শিহরিত, মুগ্ধ, অভিভুত একজন শাড়ী পরা মেয়ে নিয়া আমি মেলায় যাই। জীবনের সব সুখ মনে হয় এইখানে। বিড়বিড় কইরা হেড়ে গলায় গুন গুন করি "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ"।

মেলায় গিয়া সে এক দোকান থাইকা আরেক দোকনে যায়। এইটা রাইখা ওইটা দেখে। আর আমি বেকুবের মতো দেখি তারে। যত দেখি তত মুগ্ধ হই। অনেক্ষন মেলায় ঘুরাঘুরির পর । দুপুরের খাবারের সময় তারে কইলাম চলো আজকে তোমারে আমি খওয়ামু । দুইজন গিয়া হোটেলে একসাথে দুপুরের খাবার খাইলাম । আবার কতক্ষন মেলায় ঘুরাঘুরি কইরা। মনে মনে ফিরনের ধান্দা করতিছি । সে কইলো সন্ধ্যার অনুষ্ঠান দেখবা। আমি কই দেখমু সে কইল তাইলে আমিও দেখমু। আমি জিগাই তোমার হল তো সন্ধ্যা ৬:৩০ মিঃ বন্ধ হয়।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২২ শে জুলাই, ২০০৮ দুপুর ২:৪২

সে কয় আজকে অনুষ্ঠান এর লাইগা স্পেশাল পারমিশন দিছে। আমি কই তাইলে অসুবিধা কি? চলো একসাথে দেখমু। কিন্তু এখনও তো অনুষ্ঠান শুরু হইতে ৩ ঘন্টা বাকী । জিগাইলাম তুমি কি এখন হলে যাবা না টি এস সি তে বসবা। সে কয় আমি টি এস সি তে যামু না হলেও যামু না। আমি কই তাইলে কি করবা। সে কইলো আসো ঘুরি। আমি আসলে বুঝতে পারি নাই সে সারাদিন এর জন্য বাইর হইছে। মন তো সাথে সাথে দিল তিন খান লাফ।

তারে নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, নদীর পারে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরাঘুরি কইরা কিছুক্ষন এই জায়গায় বইসা ওই জায়গায় বইসা পার সময়টা কইরা দিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সে বেশ আন্তরিক ভাবে জিগাইতাছে এইটা কি ওইটা কি। যা পাড়ি তারে কই না পাড়লে বানাইয়া কই। তার আগ্রহটারে তো আর মাটিতে পড়তে দিতে পারি না। পড়ে অবশ্য ঝাড়ি খাইছি ।

সন্ধ্যায় গেলাম অনুষ্ঠান দেখতে। অডিটরিয়াম ভর্তি লোকজন। দুইজন বইলাম এক সাথে। অনুষ্ঠান শুরু হইলো। আলোচনা, নাচ, গান, আবৃত্তি এই সব নিয়া অনুষ্ঠান। পুলা গুলারে তো কিছু কিছু চিনি কিন্তু দেখি মাইয়া একটারেও চিনি না। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমি আমাগো ইয়ারমেট মাইরা ছাড়া আর কাউরে চিনা না। তারে জিগাইলাম এগোরে চিনো। সে আমারে নাম ধাম কইতে লাগলো। এরপর থাইক্যা যত মেয়ের নাম জানছিলাম তার কাছ থাইকাই জানসি। অনুষ্ঠান শেষ হইলো তখন বাজে রাত ৯:৩০।

তারে হলে দিয়া আইতে গেলাম। গেইটের কাছে আমার কাছ থাইক্যা বিদায় নিয়া যাওয়ার আগে কয়। ধন্যবাদ। আমি কই কি জন্য। সে কয় সব কিছুর লাইগ্যা। কইতে চাইছিলাম সেই বিখ্যাত ডায়লগ "বন্ধুত্বে নো সরি নো থ্যাংকস" ।

কিন্তু কইলাম না কারণ তার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে না।

হলে ফিরা গিয়া সোজা ঘুম। ....

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৩ শে জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৪:০৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম -বিষবৃক্ষের বীজ অংকুরোদগমের অপেক্ষা

ইদানিং আমি বন্ধুত্ব নিয়া ভাবি। বন্ধুত্বের যে সংজ্ঞা আমরা জানি তা দিয়ে আমাদের সম্পর্কের তুলনা করি। ভাবি সামথিং ইজ রং, কোথাও কোন একটা কি যেন আছে। কোথায় যেন একটু যেন ছন্দপতন । অবশ্য সম্পর্ক তৈরী হয় তার নিজস্ব আদলে। প্রতিটি সম্পর্ক তার নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে বিরাজ করে। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন মিল নেই, আর মিল থাকলেও নিজস্ব স্বকীয়তার কারণে পরস্পর আলাদা করা যায় নিশ্চিতভাবে। এ যেন এক অংকের বিন্যাস সমাবেশ খেলা। বিধাতা এই খেলার একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। তিনি সম্পর্ক ভাঙ্গেন, গড়েন ও মিলিত করেন পরস্পরকে এক নিবিড় দক্ষতায়। প্রতিদান দেন তার অদৃশ্য হাতে ভালো মন্দের এক সুক্ষ্ম বিচারে।

কিছুদিন আগেও যে ছিল নিতান্ত অপরিচিত নাম না জানা কোন মেয়ে সে এখন আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। আমার ক্লাসমেট, গ্রুপমেট, লাইব্রেরীর পার্টনার, বন্ধু। বন্ধু তাই কি? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। প্রভাতের সূর্যকিরণের মতো বের হয়ে এসে বিভিন্ন আলোকে আমার ভাবনার জগৎকে প্রভাবিত করছে প্রচন্ডভাবে। নতুন করে ভাবতে হয়। ভলোলাগা নিজেকে গ্রাস করে। আপাত বন্ধুত্বের সম্পর্ক পরিবর্তনের এক নতুন তাগিদ নিজের ভিতর উপলব্ধি করতে থাকি।

বিষবৃক্ষের অংকুরোদগমের ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়।

দৈনিক রুটিন আগের মতোই চলছে। ক্লাস, লাইব্রেরী পড়াশুনা। একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ করি ঐ দিন পর থেক ইদানিং আমাদের আলাপ চারিতার ধরন যেন পাল্টিয়ে গেছে। আরেকটু যেন উমুক্ত, আরেকটু যেন সংকোচহীন। আগে আমরা সাধারনতঃ ফরমাল টাইপের কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতাম। কিন্তু এখন দেখি সে যেন একটু বেশী বেশী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হয়। ঐ নাটক, এই গান, ঐ বই বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামতের পাশাপাশি আমার মতামত ও জানতে চায়। যেহেতু আমি গল্পের বই এবং টিভি দুইটারই ভীষন পোকা তাই তার সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে যেতে আমার খুব একটা সমস্যা হয় না। মনে মনে ভাবি বাহ বাহ তার আর আমার মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা খুজি। পাই কি?

অনেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন তীর্যকে পরিনত হইতে লাগলো। অনেকের মনে সন্দেহের বীজ বপিত হতে লাগলো। তাহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক? শুধুই বন্ধুত্ব না অন্য কিছু? নব যৌবনে এই সব তীর্যক দৃষ্টি উপেক্ষা করার যথেষ্ট সাহস নিজের মধ্যে বিদ্যমান। সমাজের বন্ধ তালা গুলি খোলার এক সুপ্তবাসনা নিজের মধ্যে কাজ করে। বিশ্বায়নের যুগের মানুষ আমি, এই সব পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমার কাজ। কিন্তু মনে মনে ভাবি সে কি করবে? কিন্তু সে আমার মতই এগিয়ে গিয়ে প্রমান করেছিল সে এইসব তোয়াক্কা করে না।

আমার রুমমেটেরা এক একজন খুব ভালো ছেলে। তার মধ্যে একজনের সাথে আমার আবার খুব খাতির হয়ে গিয়েছে, মানে সব বিষয় তার সাথে শেয়ার করার মতো সম্পর্ক । সে আমারে কয় আচ্ছা তুই যে তারে নিয়া এত ঘুরাঘুরি করতাছস তুই তো তার প্রেমে পইড়া যাবি। আমি কই কি কস বেটা। মনের মধ্যে ঘন্টি বাইজা উঠলো।

তার এই বাক্য আমার প্রেম রসায়নে প্রভাবক হিসাবে কাজ করা শুরু করলো। নিজের কল্পনায় মাঝে মাঝে তারে প্রেমিকা হিসাবে ভাবতে খারাপ লাগে না। আবার ভাবি কি কইরা তারে বলা যায় ভালবাসি। আবার নিজেরে প্রশ্নকরি আসলে কি তারে ভালোবাস?

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৩ শে জুলাই, ২০০৮ বিকাল ৪:০৩

মন কয় এই কাম করিস না নারী হইল মায়া। এই মায়ার বাধনে নিজেরে জড়াইস না। আবার নিজেরে প্রশ্ন করি আসলে সে প্রেমিকা হিসাবে কেমন। আমি যা চাই তা কি তার মধ্য আছে। এইবার মন বাবাজি ফেল মারে। চুপ কইরা থাকে। আমি কই কথা কস না কেন? মন আমার চুপ। আমি কই তাইলে চুপ থাক আমি সামনে আগাই। মন আমার আর্তি কইরা উঠে। আর্তনাদ কইরা কয় আমারে তুমি তার হাতে দিবা, তয় ভালোভাবে চিন্তা কইরা লও। সে কি তোমার এই ভালোবাসা গ্রহন করবো। এইবার আমি চিন্তায় পইড়া যাই। ভাবি দেখি আর কিছু দিন। অপেক্ষায় থাকি গ্রীন সিগনালের।

কয়েকদিন পর ৪ দিনের একটা বন্ধ পড়লো । লাইব্রেরীতে সে কয় আমি এই বন্ধে বাড়ী যামু। এই প্রসঙ্গে কইয়া রাখি তার বাড়ী ছিল ঢাকায়। বাপ-দাদার ভিটা না। তারে জিগাইলাম কিভাবে যাইবা। সে কইলো বাসে যামু। আমি কইলাম ট্রেনে যাওনা কেন। ট্রেন জার্নি বেশ মজার। এক জোসের বসে কইলাম আমিও ঢাকা যামু আমার একটু কাজ আছে। মনে মনে কই আগের ফাকা ফাকা লাগার সময়টা একটু কমাইয়া লই। সে কয় চলো তাইলে এক সাথে ট্রেনে যাই। আমি এর আগে ট্রেনে আর ঢাকা যাই নাই। মনে মনে লাফ দিয়া উঠলাম। তারে কইলাম আমি টিকেট কাইটা রাখবো । সময় তোমারে পরে জানামু । ট্রেন ছিল বিকালে আর সকালে । সবাই দেখি বিকালের টিকেট কাটে আমি মনে মনে কই আমি কাটুম সকালেরটা, তোগো সাথে যাতে দেখা না হয়। সকালের ট্রেন এর চারখান টিকেট কিইনা তারে জানাইলাম। কারণ চারটা চারটা করে একসাথে সিট থাকতো তখন। আমাদের সাথে যাতে আর কেউ না বসে এই জন্য এই ব্যবস্থা।

খুব ভোরে গিয়া তার হলের সামনে উপস্থিত হইলাম। সে সময় মতো বের হয়ে এলো। ষ্টেশন ৪ কিঃ মিঃ দূর যাইতে লাগবো ৪০ মিনিট এর মতো। যাই হোক একটা রিক্সা নিয়া দুইজন রওনা দিলাম। খুব ভোর মানুষের ব্যস্ততা এখনও শুরু হয়নি। নির্জন রাস্তা, চারপাশের চির পরিচিত দৃশ্যগুলি এই সকালে কেমন যেন নতুন নতুন লাগে। মনে মনে গান ধরি পৃথিবী বদলে গেছে যা দেখি নতুন লাগে। সে আমারে কয় এই গানটা আমার খুব পছন্দের একটা গান। আমি পুরা টাশকি। গান গাইলাম মনে মনে সে শুনলো কেমনে? তারে জিগাই কোন গান সে কয়, এই যে তুমি গাইতাছ । আমি থ। তারে কইলাম কি গান গাইছি কও তো? সে কইলো পৃথিবী বদলে গেছে যা দেখি নতুন লাগে - বুঝেন আমার অবস্থা। পড়ে অবশ্য তার মুখ থাইকা শুনছিলাম আমি গুনগুন কইরাই গান গাইছিলাম। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাইয়া কই তুমি কি গান গাইতে পার? গাও একটা। সে শুরু করলো আমি অবাক হইয়া শুনতে লাগলাম। সে খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। মনে মনে কই গ্রীন সিগনাল কি পাইলাম ? গানে হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় চেয়ে দেখি রিক্সা শহরের মধ্যে ঢুইকা পড়ছে। গান আর পুরাটা শুনা হইলো না। পড়ে অবশ্য ..

ষ্টেশনে পৌছে আমরা একসাথে নাস্তা করে ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম। আন্তনগর ট্রেন ঠিক সময় মতোই এলো। দুইজন গিয়ে ট্রেনে উঠলাম জানালার ধারে পাশাপাশি সিট। সময় মতো ট্রেন ছাড়লো। ঝিক ঝিক শব্দে জানালার পিছননে ব্যাকগ্রাউন্ড বাদলাইয়া যাইতে লাগলো । দুইজন আলাপে আলাপে সময় কাটতে লাগলো। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতা। এর মধ্যে সবকিছুই বিদ্যমান আবার কিছুই না। আমি তার সঙ্গ উপভোগ করতে লাগলাম। আগামী কয়েক দিনের আলাপ এইখানে ট্রেনে সারিয়া ফেলতে ব্যাস্ত হলাম। ট্রেন লাইন ঢাকা যেতে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া যায়। যথারীতি সেই এলাকা আসিয়া গেল আমরা দুইজন জঙ্গল দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি জঙ্গলের রাস্তায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হাত ধরা ধরি করে হাটছে। এই দৃশ্য দেইখা ঝট কইরা আমি তার দিকে চাই দেখি সে আমার দিকে চাইয়া রইছে। দৃষ্টি বিনিময় হইলো। মনে মনে কই গ্রীন সিগনাল কি পাইলাম? তারপর দেখি সে কেমন যেন একটু চুপচাপ হইয়া গেল। যাইহোক টুকটাক আলাপ করতে করতে সময়টা পার করে দিলাম।

ধীরে ধীরে ট্রেন কমলাপুর ষ্টেশন আইসা পৌছইলো, আমি তারে বেবীতে তুইলা দিলাম। এবং আর একটা বেবী নিয়ে সোজ বাসষ্টেশনে পরের বাসে আবার ইউনিভার্সিটিতে ।

হাত তুইলা কই ধন্যবাদ বিধাতা এমন সুন্দর একটা জার্নি উপহার দেওয়ার জন্য।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৪ শে জুলাই, ২০০৮ রাত ১১:৩৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - বিষবৃক্ষের অংকুরোদগম

সম্পর্কের পরিবর্তন হয়তো সহসাই ঘটে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কিংবা নিদৃষ্ট পরিকল্পনা করিয়া ইহার পরিবর্ত অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে এই দূরহ অবস্থায় উপনীত হইলাম। বিশেষ করে এই নব যৌবনে যখন মন থাকে অস্থির প্রকৃতির, সর্বদা রোমাঞ্চের সন্ধান করে, বাধাহীন দূর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে চায়, প্রকৃতির মতো সমস্ত বাধাকে পদদলিত করে এগিয়ে যাওয়াই যার একমাত্র লক্ষ তাকে আপনি আমি কি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবো। সময় নামক মাত্রা সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এই মনকে বশ করা বড় কঠিন।

যাইহোক ঢাকা হইতে ফিরে এলাম সমস্ত সত্তা জুড়ে এক তৃপ্ত অনুভুতি নিয়ে। এখন ও আমি ঠিকভাবে বুঝিতে পারছি না । গ্রীন সিগনাল কি পেয়েছি? মনে মনে ভাবি সে তো আসবে চারদিন পর। এই চারদিন ভেবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়া নিব। সে ফিরা আইলো।

তার সাথে আমার প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে। সব বলতে গেলে বহু বড় হইয়া যাইবো।

আবার আগের রুটিন মাঝখানে যোগ হইছে সন্ধ্যার আগে আগে টিএসসি তে বইসা আড্ডা মারা এবং সন্ধ্যার পর হল বন্ধ হওয়ার আগে তারে হলে পৌছাইয়া দেওয়া। তাগো হলের সামনে, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির করিডোর হইলো প্রেমিক প্রেমিকাদের স্বর্গ রাজ্য। জোড়ায় জোড়ায় তারা বইসা থাকে। তাগোরে দেইখ্যা বড় আফসোস হয়। কবে যে বমু এই জায়গা গুলাতে। তারে কইতে তো মন চায় কিন্তু সাহস হয় না। কারণ গ্রীন সিগনাল তো এখনও পাই নাই।

ইচ্ছা কইরা ইদানিং তার সাথে পড়ালেখার আলাপের চেয়ে অন্য আলাপ করি বেশী। মনে আশা যদি এই আলাপের মধ্যে গ্রীন সিগনাল পাই। প্রেম বিষয়ক আলোচনা যে হয় না তা নয়। বিভিন্য টিভি নাটকের প্রেম প্রসঙ্গ ইচ্ছা কইরা আলাপের মাঝে তুইলা দেই। দেখি সে সুন্দর ভাবে আলাপ চালাইয় যায় কিন্তু সিগনাল নামক বস্তুটি সেখানে নাই। তখন পুর্ণেন্দু পত্রীর কথপোকথন এর বিশাল হিট। একদিন একটা কপি জোগার করলাম। এইডা নিয়াও কথা হয় কিন্ত সিগনাল তো আর পাই না। তারে জিগাই আচ্ছা তুমি কি কাউরে ভালোবাস? সে কয় না। আস্তে আস্তে বুঝতে পারি এড়ায়া যাইতেছে। মনে মনে কই তুমি বড় খতরনাক চিজ্। কিযে আছে কপালে। ভালোবাসার কথা তারে আর বলা হয় না।

আমাদের ক্লাসের এক ছেলে ছিল আমরা সবাই তারে ডাকতাম মামু এবং আমরা একই হলে থাকতাম। সে অনেকটা ভারিক্কী চালে চলাফেরা করতো। বিকাল বেলা আমার রুমমেট, মামু আর আমি ঘুরতে বাইর হলাম। এক পর্যায়ে মামু আমারে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা ভাইগনা তার সাথে তোর কি সম্পর্ক? আমারে সত্য কইরা কতো দেখি। আমি তার জবাবে একটা মুচকি হাসি দিলাম তাতেই যা বুঝার বুইঝা লইলো। আমার মনে তখন অনেক কথা জমা হইয়া রইছে তাছাড়া একটি সিদ্ধান্ত তো নিতে হবে। মামুরে কইলাম তার সাথে আমার এখন পর্যন্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিন্তু মামু আমি তো এইডা চাই না। এখন কি করি কওতো। তারে সব কথা কইলাম । শুইনা কয় তলে তলে এই। তুই তো গেছস। আর ফিরা আইতে পারবি না। আমি কইলাম আমিতো মামু ফিরা আইতেও চাই না। সে কইল চিন্তা করিস না তোর প্রেম হইয়া যাইবো। আমি কই কেমনে হইবো। তুই তারে কইয়া দে যে ভালবাসস । আমি কই কেমনে কমু যদি রাজী না হয়। মামু কইলো সে অবশ্যই রাজী হইবো।

দিন যায় আমার ভালোবাসার দিন আর আসে না। তারে নিয়া সারাদিন থাকি বিভিন্ন কাহিনীর রচনা দেই মাগার গ্রীন সিগনাল তো আর পাই না।
ভাবি যা শালা কইয়া দেই। যা হইবার হইবো।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৪ শে জুলাই, ২০০৮ রাত ১১:৩৪

একদিন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আজকে তারে কমুই । যথারীতি তারে কইলাম চলো ঘুরি । আর কিছু না কইয়া একটা একটা রিক্সা ভাড়া করলাম ঘন্টা হিসাবে। তারে নিয়া ৪ ঘন্টা ঘুরলাম । তারে কইলাম ঐ দিনে গানটা তো শেষ করা নাই আজকে গাও। সে গাইলো। গান শেষ হওয়ার পর মনে হইলো এইবার কইয়া দেই। কিন্তু মুখে আটকাইয়া গেল। কইতে পারলাম না।

পরদিন ক্লাসের ফাকে সে মামুরে ডাইকা কয় - তোমার সাথে কথা আছে । আমি মনে মনে ভাবি মামু সাথে তার কি কথা? আবার কই কথা তো থাকতেই পারে। ক্লাস শেষে সে মামুর সাথে বাইর হইয়া গেল। আমি মনে করলাম টিএসসিতে যায়। টিএসসি গিয়া দেখি তারা নাই। হলে যামু বইলা বাহির হইতেছি দেখি অন্য ফ্যাকাল্টির বন্ধুর সাথে দেখা। সে জিগাইলো কই যাস । আমি কইলাম মামু আর তারে খুজতে আইছিলাম, না পাইয়া হলে যাইতেছি। সে কইলো তাগোরে দেখছি নদীর দিকে যায়। আমি পুরা টাশকি। কি কয়? কইলাম - তুই দেখলি কই। সে কয় আমি মেডিকেল এ গেছিলাম আসার সময় দেখি। আমাদের মেডিকেলটা আবার নদীর পাশে ছিল। আমি কইলাম আচ্ছা। মনে মনে চিন্তা করি ঘটনা কি। কৌতুহল না বাড়াইয়া গেলাম নদীর পারে। দেখি তারা দুইজন নদী পাড়ে বইয়া রইছে। বিকালে মামুরে জিগাই - মামু সে তোমারে কি কইলো। মামু কয় না। রহস্য করে। তারে হাতে পায়ে ধইরা কই - প্লিজ মামু কও। তুমি যা খাইতে চাইবা তাই খাওয়ামু। মামু সিরিয়াস ভঙ্গি লইয়া কইলো সে কইছে আমি মনে হয় তারে ভালবাসার কথা কইতে চাই। কিভাবে তারে এড়ানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইছে। কারণ আমি তার গ্রুপমেট, লাইব্রেরীমেট। আমি কইলাম মামু তুমি আমার পক্ষ লইয়া কিছু কও নাই। মামু কয় তারে আমি কইছি যদি তুমি প্রেম নাই করবা তয় তারে লইয়া এতদিন ঘুরলা কেন। আবার এইটাও কইছি কালকে থাইক্যা তারে আস্তে আস্তে এড়াইয়া চলা শুরু করো প্রয়োজনের বেশী ঘুরাঘুরি কইরো না। আস্তে আস্তে ঠিক হইয়া যাইবো।

আমি কইলাম শালা সাপও মারলা লাঠিও ভাঙ্গলা। সে কয় শোন সবকিছু বাদ দে কালকে সকালে তর তারে গিয়া কইতে হইবো। নাইলে তোর আমও যাইবো ছালা ও যাইবো। বুঝেন আমার অবস্থা । ভাগ্য ভালো বন্ধের দিন ছিলো। সাররাত তার সাথে আমার ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলা ভাবলাম। শেষ রাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম কালকেই তারে কমু। তখন ঘড়িতে ভোর ৪:২৩মি । সকাল তো হইয়াই গেছে। রাতটা জাইগা কাটাইয়া দেই। সকলা ৭টার সময় তার হলের সামনে আমি উপস্থিত। গেটের দারোয়ানরে দিয়া তারে খবর দিলাম। সে আইলো আমি তারে কইলাম চলো টিএসসি তে যাই। সে খানিক ইতস্তত করলো। আগে কোন দিন তারে ইতস্তত করতে দেখি নাই। সাথে সাথেই আবার আমার সাথে টিএসসির দিকে রওনা দিল। গেলাম টিএসসিতে। গিয়া বইলাম পিছনের দিকে খালি জায়গা দেইখা। চা এর কথা কইয়া সোজা কোন ভনিতা না কইরা কইলাম। শোন তোমারে এখন আমি কিছু কথা কমু। মন দিয়া শোনা। কালকে সারা রাত ধইরা চিন্তা কইরা বাইর করছি আমি প্রেম পড়ছি। এইখানে আশা করছিলাম সে জিগাইবো কেডা । সে চুপ কইরা বইসা রইলো। আমি কইলাম সেই মাইয়াডা হইলো তুমি। এখনই আমারে তোমার সিদ্ধান্ত জানানোর দরকার নাই। তুমি সময় নেও। ভাইবা চিন্তা আমারে সিদ্ধান্ত জানাইয়ো।

সে চুপ কইরা বইসা রইলো।

এইখানেই বিষবৃক্ষের অংকুরোদগম হইলো।

কিছুক্ষন ধইরা নিজের সামলাইলো । আমি তার চোখের দিকে চাইয়া রইলাম । কিঞ্চিত মুক্তা বিন্দু সেখান থেক ঝড়ে পড়লো । কইলো...

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৬ শে জুলাই, ২০০৮ দুপুর ১:২৪

বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রেম - বিষবৃক্ষ এখন চারা গাছ

আমি মনে হয় কিঞ্চিত বুঝতে পারছিলাম সে এই কথা গুলি কইবো।

সে একটু দম নিয়া কইল, *আমি এই ভয়টাই করতেছিলাম। এই সম্পর্কটা তো সম্ভব না।* আমি তারে জিগাই কি জন্য সম্ভব হবে না। সে কয় সম্ভব না। আমি তারে কইলাম আচ্ছা তুমি চিন্তা কইরা দেখ। সে উত্তর দিল আমি চিন্তা কইরাই কইতাছি। কইলাম আচ্ছা আর একবার চিন্তা করো পরে আমাকে জানাইও। সম্পর্ক না করতে চাইলে নাই। এতে তো আর জোড়াজুরির কিছু নাই। মনে মনে ভাবলাম মনে হয় পরে রাজী করানো যাইবো। হাইরা যাওয়ার পাত্র আমি না। রাজী তোমার হইতেই হইবো। আমার তখন একটা ঘোর লাগা অবস্থা। তার কথাগুলার মর্ম তখনও আমার ভিতর ঢুকে নাই। তাই আমি খুব স্বাভাবিক ছিলাম। পরে এইটা আমারে একটা প্লাস পয়েন্ট দিছিল। আমি দেখি এই সম্পর্কের মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। আর সে কয় এইটা সম্ভব না। এই বিপরীতমুখী যুক্তির কাছে আমার যুক্তিরেই আমি প্রাধান্য দিমু এইটা জানা কথা। পরে কথা হইবো বইলা তার কাছ থাইকা বিদায় নিয়া চইলা আইলাম ।

হলে ফিরা গেলে মামু আমারে জিগায় কি হইছে তারে কি কইছস? আমি তারে ঘটনা খুইলা কইলাম। সে কয় এইডা কিছু না। পরে অবশ্যই রাজী হইবো। আমি মামুরে কই মামু তুমি কি তারে একটু জিগাইবা ? মামু কয় আচ্ছা রাইতে টেলিফোন কইরা জিগামুনে। তুই এখন গিয়া ঘুমা। তখন তো আর মোবাইল ছিল না। হল থাইকা টেলিফোন কইরা দারোয়ান দিয়া ডাকাইতে হইতো। আমি গেলাম ঘুমাইতে। কিন্তু ঘুম কি আর আসে। সন্ধ্যার পর মামু আমার সামনেই তারে টেলিফোন করলো এবং আমার ব্যাপারটা তারে জিগাইলো। সে কয় আমি তো তারে কইয়া দিসি। মামু জিগায় তুমি কি চিন্তা কইরা কইতাছ। সে কয় আমি চিন্তা কইরাই কইতাছি। মামু টেলিফোন রাইখা দেয়। আমারে কয় তুই চিন্তা করিস না দেখবি ঠিক হইয়া যাইবো। আমি আর কিছু কই না।

তার কথার মর্মগুলা আমি আস্তে আস্তে উপলব্ধি হয়। ধীরে ধীরে আমার সাজানো স্বপ্নগুলা চুরমার হইয়া যাইতে দেখি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বড় তীব্র। আজও কারও স্বপ্ন ভাঙ্গতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। খুব কষ্ট হইতে থাকে। এইগুলা আসলে প্রকাশ করা যায়না। পায়ের নীচের মাটি আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে। বুঝতে পারি আমার ভুলে মাত্রা। বুঝতে পারি আমি এতক্ষন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এর মধ্যেই আমি আমার সবচেয় বড় ভুল কইরা ফালাইছি। আমার সমস্ত স্বত্তা নিমজ্জিত হয় দুঃখ আর ভয়ের সাগরে। হলের বাইরে আইসা একলা একলা চুপচাপ বইসা ভাবি আমার ভবিষ্যৎ দিনের কথা। নিজেরে বড় ফালতু মনে হয়। নিজের সম্পর্কে ধারনা পালটিয়ে যেতে থাকে। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।

বিবেক আমারে কয় নিজেরে সামলাও। নিজেরে সামলানোর একটা তাড়া অনুভব করি। ভাবি তার সাথে আর যোগাযোগ না করার কথা। সাথে সাথে মনে হয় আমি আমার নিজের পাতা জালে নিজে ফাইস্যা গেছি। কারণ সে আমার গ্রুপমেট, এসাইন্টমেন মেট। লাইব্রেরী আর ক্লাস না হয় বাদ দিমু কিন্তু গ্রুপ আর এসাইন্টমেন্ট কেমনে বাদ দিমু।

আমি এখনও ভাবি আমার মধ্যে এত শক্তি কিভাবে ছিল। নিজেরে সামলাইয়া লই। সিদ্ধান্ত নেই নিজের কষ্ট অন্যরে বুঝাইয়া কোন বাহাদুরি নাই। কাউরে বুঝতেই দিমু না আমি কষ্ট পাইছি। এমনকি তারেও না। আমি অবশ্য তা করতে পারছিলাম। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দেখলাম আমার আর কষ্ট নাই।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৬ শে জুলাই, ২০০৮ দুপুর ১:২৪

পরদিন সকালে উইঠা স্বভাবিক ভাবেই ক্লাসে গেলাম । একটু একটু ভয়ে ছিলাম তারে দেইখা আমার আবার কি রিএকশন হয়। দেখলাম কিছু হয় নাই। মনে মনে বিধাতারে ধন্যবাদ দিলাম। ক্লাস থাইকা বাইর হইয়া হলের দিকে যাইতাছি দেখি সে লাইব্রেরীর সামনে খারাইয়া রইছে। তার কাছে গেলাম কইলাম কই যাইবা। সে কয় হলে। অথচ আমরা এই সময় লাইব্রেরীতে যাইতাম। একদিনে কি ব্যবধান। আমি কইলাম চলো তোমারে হলের দিকে আগাইয়া দেই কিছু কথা আছে। সে জাগাইলো গতকালের ব্যাপারে ? আমি কইলাম ন্যাড়া বেল তলায় একবারই যায়। আমি যা কমু তা হইলো আমি তোমারে প্রপোজ করছি এইডাতো আর কেউ জানে না। তুমি না করছো ব্যাস, জিনিসটা এইখানেই বাদ দেও। আমার সাথে বন্ধুর সম্পর্ক না রাখতে চাইলেও কোন আপত্তি নাই। তয় হঠাৎ কইরা বাদ দিও না। হঠাৎ বাদ দিলে সবাই বুইঝা ফালাইবো। আমি চাইনা এইডা সবাই বুঝুক, আমাদের আরও কয়েক বছর এক সাথে থাকতে হইবো। সে কয় আচ্ছা। মনে মনে চিন্তা করি এই মাইয়ার থাইক্যা আমারে মনরে সর্বদা ১০০ হাত দূরে রাখতে হইবো। খুর সাবধান। তারে হলে পৌছাইয়া দিয়া হলে ফিরা যাই।

পরদিন সে ক্লাসে নাই। জানতে পারলাম সে হঠাৎ কইরা ঢাকা গেছে। ক্লাস চলে সে ঢাকায় মনে মনে কই হয়তো জরুরী কোন দরকার পরছে। পড়ে জানতে পারি (তার কাছ থাইক্যা) আমার প্রপোজ পাইয়া সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পাইরা ঢাকা গেছিল তার এক স্যারের কাছে। সেই স্যারের কাছে গিয়া কইছিল স্যার এই এই ব্যাপার ঘটছে। এখন আমি কি করমু, স্যার কইছিল আর কি করবা প্রেম চালাইয়া যাও। কারণ তুমি প্রেমে পড়ছ সিদ্ধান্ত নিতে না পাইরা আমার কাছে আইছো। আমি না কইলেও তুমি প্রেম করবা। এর থাইক্যা তোমার মুক্তি নাই। আমি অবশ্য হাসতে হাসতে কইছিলাম প্রেম করবা তুমি আর সিদ্ধান্ত দিবো স্যারে বাহ বাহ। এই জন্য আমার কয়েকটা কিল্ খাইতে হইছিল।

আমি তো আর এইসব ঘটনা কিছু জানি না। সে ফিরা আইলো। আমি তখন তার কাছ থাইক্যা ১০০ হাত দূরে থাকার বন্দোবস্ত কইরা ফালাইছি। গ্রুপের প্রাক্টিক্যালটা একসাথে করি। এসাইন্টমেন্ট দিলে তারে কই তুমি কইরা ফালাও আমি কপি করমু নে। কি করমু প্রতিদিনই একটা না একটা এসান্টমেন্ট দেয় । আগত্যা না পারলে তার সাথে লাইব্রেরীতে যাই। অর্ধেক কইরা ফুটি। তারে এখন অনেকটা অচেনা অচেনা মনে হয়। মনে মনে কই বাহ এইতো মন বশ মানতাছে। আর কিছুদিন তারপর ফুট। বেল তলায় আর যামু না।

ইদানিং তার ব্যাবহারে বেশ পরিবর্তন দেখি। মনে হয় সে আগের মতোই আমার সাথে সব সময় থাকতে চায়। আমি কেন জানি বুঝতে পারি। তার ব্যবহার এতদিনে কিছুটা হইলেও বুঝছি। মনরে সাবধান করি। দেখি ক্লাসের পরে লাইব্রেরীতে যাইতে কয় মাঝে মাঝে যাই আবার পারলে এড়াইয়া যাই। বেশীক্ষন তার সাথে থাকাটা বিপদজনক মনে হয়। কারণ আমি স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করলেও নিজেরে তো নিজে চিনি, মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। মনে হয় এই রকম না হলেও তো পারতো।

এখন তার সাথে আমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কথা বলি না। আমার চিন্তা হইতেছে এখন কিছুদিন গেছে আর কিছুদিন পর তার সাথে সব কিছু পুরাপুরি বন্ধ কইরা দিমু। তার ভাবে সাবে মনে হয় সে কিছু কইতে চায়। আমি এড়াইয়া যাই। একদিন ক্লাসের পর কয় চলো শহরে যাই আমার কিছু কেনাকাটা আছে। আমি মনে মনে কই সে আমারে পাইলো কি? দুনিয়ার এতো মানুষ থাকতে আমি কেন? মুখে কই কই তোমার সাথে শহরে যামু না। আমার মনরে আমি চিনি আবার পাল্টি খাইবো। কইয়া হাইসা দেই। সে কয় পাল্টি খাইলে খাইবো। চলো । আমি কই আমার সমস্যা আছে । সে জোড় কইরা আমারে শহরে নিয়া যায়।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৬ শে জুলাই, ২০০৮ দুপুর ১:২৪

আমি রিক্সায় উইঠা শক্ত হইয়া বইয়া থাকি। দেখি সে গুন গুন করে। আমি মনে মনে কই মর জ্বালা এ কার পাল্লায় পরলাম। যাইহোক শহর থাইক্যা ফিরা আইসা সে জিগায় মন কি পাল্টি দিসে? রাগে আমি আর কিছু কই না। অবশ্য কইলে সেইদিন প্রেমটা হইয়া যাইতো (তার কাছ থাইক্যা শুনা)।

দিন যায়। আমি মুটামুটি নিজেরে সামলাইয়া নিছি। কষ্ট যে একেবারে নাই তা না। তবে কষ্টের তীব্রতা অনুভব করি কম। তার সাথে এখন আমার ক্লাসের বাইরে দেখা হয় কম। এসাইন্টমেন্ট এর চাপও কমাইয়া দিসি, মানে একসাথে কয়েকটা কইরা জমা দেই। একদিন বিকালে এসাইন্টমেন্ট এর পর সে কয় চলো টিএসসিতে যাই। আমার মনে সন্দেহ হয় । সাথে সাথে আবার সন্দেহ ঝাটাইয়া বিদায় করি। যাই তার সাথে টিএসসিতে। চা খাই। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সে কয় চলো ঘুরি। আমি মনে মনে কই হইলো কি। মনে কোন সন্দেহ আনি না। কারণ চুন খাইয়া মুখ পুড়ছি। যাইহোক টিএসসির ফ্লোরটা গ্রাউন্ড থাইক্যা কিছুটা উঁচা। একদিকে সিঁড়ি আছে ওই দিক দিয়া গেলে একটু ঘুরতে হয়। আবার আরেকদিকে একটি শর্টকাট আছিল রাস্তায় উঠার, আমি সেই দিক দিয়া গেলাম। ফ্লোর থাইক্যা লাফ দিয়া নাইমা দেখি সে আর নামতে পারে না। কারন তার সাথে ব্যাগ বই পত্তর আছিল। আমি হাত বাড়াই দিয়া শয়তানি কইরা কই। ওই দিন মন দিছিলাম নেও নাই। এইবার হাতটা দিলাম ধরলে ধরতে পারো। সে আমার দিকে চাইয়া রইলো। আস্তে আমার হাতটা ধইরা নামলো। নাইমা কয় ধরলাম। আর হাত ছাড়ে না। সময় যায়।

আমি সম্বিত ফিরা পাইয়া কই - তুমি আমার হাত ধরলা? সে কয় ধরলাম আর ছাড়ুম না। আমি টাশকি খাইয়া গেলাম। মুখ দিয়া কথা বাইর হয় না। দুইজন গিয়া রাস্তায় উঠলাম। সন্ধ্যার সময় এই রাস্তাটা খালি থাকে। তারে আবার জিগাই তুমি আমার হাত ধরলা। সে কয় - ধরলাম। আমি হাতটা তার দিকে বাড়াইয়া দিয়া কই আবার ধরোতো। সে আবার ধরলো। জিগাইলাম ছাড়বা না তো? সে কয় না ছাড়মু না। কি আর করা তারে বুকে টাইনা নিলাম। দুইজনের চোখ দিয়া আপনা আপনি পানি পড়তে লাগলো।

সেই চোখের পানিতে বিষ বৃক্ষের অঙ্কুর চারা গাছে পরিনত হইল।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২০ শে আগস্ট, ২০০৮ রাত ৮:০১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ৯

হঠাৎ রিক্সার বেলে পাইয়া সম্বিত ফিরা পাই। শুনতে পাই রিক্সার প্যাসেঞ্জাররা কইতেছে - প্রেম করার আর জায়গা পায় না, একবারে রাস্তার মধ্যে। ভাগ্য ভালো যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছিলনা।সন্ধ্যা তখন অনেক হয়ে গেছিল। তাই তারে আর কিছু কইতে পারলাম না। সোজা হলে পৌছাইয়া দিয়া নিজের ডেরায় ফিরে যাই। রুমমেট জিগায় কি খবর আমি উত্তর দেই ভালো। নিজের ভিতর তখন ভীষণ আনন্দ এক অন্যরকম অনুভুতি, সব পাওয়ার তৃপ্তি, আমি আবেশিত - এ ঠিক বুঝানো যায় না। রুমের মধ্যে রুমমেটদের সাথে থাকতে ইচ্ছা করতাছে না। তাই আস্তে কইরা রুম থাইক্যা বাইর হইয়া আইলাম। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কিছুক্ষন ঘুরাঘুড়ি কইরা গিয়া দাড়াইলাম লেকের পাড়ে। এইখানে বলা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে একখান বিরাট লেক আছিল। লেকের পারে চুপ কইরা বসলাম। রাত্রিবেলায় লেকের পানিতে হলগুলার আলো আইসা এক অদ্ভুদ পরিবেশ সৃষ্টি করে। বইসা বইসা তাই দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষন পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমি আসলে কিছুই ভাবতাছি না। আসলে বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটরে মানুষে মস্তিস্ক ঠিকভাবে কাজ করেনা বইল্যা মনে হয়। মনে মনে কই এইডা কেমন কথা। আজকে এত্তবড় একটা ঘটনা ঘটলো আর আমি তা নিয়া কিছুই ভাবতাছি না এইটা কেমনে হয়।

সাথে সাথে সন্ধ্যার ঘটনাগুলা আস্তে আস্তে চোখের সামনে রিপ্লে হইতে থাকে। আমি চুপ কইরা দেখি - আমি রোমাঞ্চিত হই, শিহরিত হই বিভিন্ন অনুভূতির তরঙ্গ আমার শরীরের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হইতে থাকে। রিপ্লে শেষ হয় সম্বিত ফিরা পাই নিজে নিজে একটু লজ্জা পাই। মনরে বলি তোমার একলা একলা দিন শেষ। তোমার মনের সাথে এখন আরকেজনের মন যুক্ত হইছে। মন কয় আমি আনন্দিত। শুইন্যা খুশী হই। পাশ থাইক্যা বিবেক বেটা আইস্যা কয় এত ফাল পারতাছস কেন ভবিষ্যত লইয়া চিন্তা কর। সম্পর্ক বানানো খুব সোজা কিন্তু সেই সম্পর্কে সঠিক পরিনতিতে নিয়া গেলে তবেই না সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা হয়। আমি চিন্তা করি তাইতো যে সম্পর্কে সুত্রপাত আজকে হইছে তা তো ক্ষনিকের কোন সম্পর্ক না। আমি উত্তর দেই আমি সম্পর্কতো ক্ষনিকের জন্য করি নাই এই সম্পর্কটাকে আমি সারাজীবন টিকিয়ে রাখবো।

হঠাৎ মনে হয় মামুরে বিষয়টা জানানো দরকার। লেকের পাড় থাইক্যা উইঠা পড়ি যাই মামুর হলে। মামুরে ডাইক্যা আইনা - কই মামু ঘটনাতো ঘটছে মামু জিগায় কি ঘটছে? তারে কইলাম সে তো রাজী হইয়া গেছে। মামু উত্তর দেয় তোরে কইছিলাম না সে রাজী হইবো । যাই হোক ভালো হইছে । আমার খাওন কই? আমি মামুরে কই কি খাইবা কও, যা খাইবার চাইবা তাই খাওয়ামু। সে কয় এইখানে খাওয়াইলে চলবো না শহরে নিয়া গিয়া খাওয়াইতে হইবো। আমি কই তাই সই চলো এখন। মামু কয় এখন না কালকে খাওয়ানো লাগবো। আমি কইলাম আচ্ছা।

চইলা আইলাম হলে । ছাদের দিকে মুখ কইরা শুইয়া রইলাম কিন্তু ঘুম কি আর আসে। চোখ বন্ধ করলেই তার মুখ দেখি আর তারে দেখলেই ঘুম ১০০ হাত দুরে যায়। যাইহোক এপাশ ওপাশ কইরা কখন যে ঘুমাইছি তা কইতে পারমু না।

রুমমেটের ডাকে সকালে উঠলাম। তাড়াতাড়ি রেডি হইয়া গেলাম ক্লাসে। ক্লাসে গিয়া দেখি সেও আছে। তারে জিগাইলাম কেমন আছো । নিজের মধ্যে একটা চোর চোর ভাব এই বুঝি সবাই বুইঝা ফালাইলো। নিজের কিছুটা সময় নিয়া সামলাইলাম। মামু শালা এমন বদের বদ খোচা মাইরা কয় কিরে তোর কি হইছে কমু? বুঝেন আমার অবস্থা। কানে কানে মামুরে তোমার পায়ে ধরি মামু ক্লাসের সবাইরে কিছু জানাইও না। তারপরও শালার মামু আমার রুমমেটরে দিল কইয়া।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২০ শে আগস্ট, ২০০৮ রাত ৮:০১

ফলাফল জরিমানা দ্বিগুন হইলো। সুবিধা একটা হইলো তাগোরে কইলাম আজকে খাওয়াইতে পারুম না, আগামী মাসের টাকা আইলে খাওয়ামু । তারা রাজী হইলো।

ক্লাসের ফাকে ফাকে তার দিকে তাকাই দুই তিন বার চোখা চোখি হইলো। বড় পুলক অনুভব করি। যাইহোক ক্লাস শেষে বাইর হইয়া দাড়াইলাম দেখি সে অন্য দুই মাইয়ার সাথে আলাপ করতাছে। অন্যদিন হইলে তো ডাক দিতে পারতাম কিন্তু আজকে অন্যরকম। বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে হইলো না সে আইলো আমার কাছে জিগায়

কি?
আমি শালা বেকুব ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম।
কি খবর?
ভালো, কেমন আছো?

পরানডা জুরাইয়া গেল। মনে হইলো কতদিন এই কন্ঠস্বরটা শুনার অপেক্ষা করতেছিলাম। কইলাম চলো এইখান থাইক্যা যাই। দুইজন মিইল্যা গেলাম নদীর পাড়ে। বসলাম সেই বিখ্যাত বেঞ্চি গুলার একটাতে। সময় যায় চুপ কইরা দুইজন বইয়া থাকি। কেউ কোন কথা কই না। মুখ দিয়া কথা বাইর হয় না। আসলে কি কমু তাই পাইতাছি না। নিরবতা ভাঙ্গিয়া তারে কই চুপ কইর আছো কেন, কিছু কও। সে জিগায় কি কমু। সে কয় আমার খুব ভয় লাগতাছে। আমি তারে কই ভয় লাগনের কি আছে? আমি তোমারে ভালবাসি তুমি আমারে ভালবাস ব্যাস ল্যাঠা চুইক্যা গেল। সে জিগায় তুমি আমারে সারা জীবন ভালোবাসবা তো? কথা দেও। তারে কথা দেই আমি তোমারে সারাজীবন ভালবাসমু। আবার চুপ কইরা বইসা থাকি। মনে হয় সব কথা শেষ। নদীর দিকে তাকাইয়া থাকি। সময় গড়ায় দুপুর থাইক্যা বিকাল হয়। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়া দুইজন বইসা থাকি। কথা কওনের চেয়ে তার পাশে বইসা থাকাই অনেক আনন্দের মনে হয়। সেই চেনা মুখটা আবার নতুন কইরা চিনতে থাকি। অপলক দৃষ্টিতে তারে দেখি ভাবি এই মাইয়াডারে আমি ভালবাসি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়। তার হলে যাওয়ার সময় হইয়া আসে আমরা দুইজনের মধ্যে কোন কথা হয় না বাইসা থাকা ছাড়া। শেষ মুহুর্তে ভাবি আরে তারে তো কিছুই বলা হইলো না। বলার মতো কথা কিছু খুইজ্যাও পাই না। সময় শেষ হইলে তারে হলে দিয়া আইতে যাই । হলে ঢুইক্যা যাওয়ার মুহুর্তে তারে আস্তে আস্তে কই আমি তোমারে খুব ভালবাসি। সে উত্তর দেয় আমিও।

হলে ফিরা গিয়া গোসল, খাওয়াদাওয়া কইরা সোজা বিছানায়। মনে কিঞ্চিত অতৃপ্তি কোন কথা বলতে না পারার লাইগ্যা । মন রে কই প্রতিদিন তার সাথে দেখা হইবো কথা হইবো আজকের দিনটা না হয় মৌনতা দিবস হিসাবে রইয়া গেল। মন তৃপ্ত হয়। সাথে সাথে ঘুম । এত আরামের ঘুম আমি আর ঘুমাইছি বইল্যা মনে হয় না।

নিজের অজান্তে বিষবৃক্ষের চারা বড় হইতে থাকে

২৩ শে আগস্ট, ২০০৮ দুপুর ১:০৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম -১০

পরদিন, সকালে উইঠ্যা ক্লাসে গেলাম। দুইজন বসলাম পাশাপাশি। তার পাশে বইসা ক্লাস আর করুম কি মাস্টারের সব কথা যায় আমার মাথার উপর দিয়া। আমি তখন অন্য জগতের মানুষ। ভাগ্য ভালো মাস্টার কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই আর আমিও বাইচ্যা যাই। সচরাচর মাস্টাররা বেশী জিগাইতো না।

যাই হোক আবার আগের রুটিনে ফিরে গেলাম। ক্লাস, লাইব্রেরী ও নদীর পার এই নিয়া আবর্তিত হইতে থাকে আমাদের পৃথিবী। দিন যায়..

একদিন তারে কই চলো আজকে ঘুরি, সেও কইলো চলো । চিন্তা কইরা বাহির করলাম কই যাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টের জায়গা ছিল। আগেও গেছি ক্লাস করতে। সামনে দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ফষলের মাঠ মাঝখানে কনক্রিটের রাস্তা। ঠিক মাঝখানে একখান ফার্ম হাউজ। কান পাতলেই বাতাসের ও ধানের পাতার তৈরী শিস শোনা যায়। একটু দূরে হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলাপান কাজ ছাড়া এই এলাকায় আসতো না। জায়গাটা মুটামুটি নির্জন থাকে। জায়গাটা কথা মনে হইতেই একখান রিক্সা লইয়া গেলাম সেখানে। ফার্ম হাউজের সামনে রিক্সা ছাইড়া দিয়া মুক্ত প্রান্তরে তারে নিয়া ঘুড়ি । মনে হয় আমরা কোন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। মন আবেশিত হয়, তার হাত ধরতে ইচ্ছা করে । আস্তে তার হাত ধরি সেও না করে না। যেন পরম ভরসায় সে আমরা হাতে মৃদু চাপ দেয়। দুইজন হাত ধরাধরি কইরা হাটতে থাকি। এ এক অনন্য অনুভুতি। অন্যরকম ভাললাগা।

একটু দূরে ছিল একটি কলার বাগান। সেইটা দেইখ্যা মনে পড়লো খানা সেই বিখ্যাত বচন-

কলা রুয়ে না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত

তারে কইলাম খনার বচনটা অবাক হইয়া লক্ষ্য করলাম সে খনা কে সেইটা জানে না। অগ্যতা তারে খনার কাহিনীখানা কইলাম। মানে তখন যতটুকু জানতাম আর কি। তার সঙ্গে বিভিন্ন আলাপে আলাপে সময় পার হইতে লাগলো।

সময় যায় ...

দুপরের সূর্য অনেক আগেই পশ্চিমে হেলে পড়ছে। কিন্তু মনে হয় সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। তারে কইলাম চলো যাই। সে কয় আর একটু থাকি। থাকলাম আর কিছু সময়। জিগাইলাম জায়গাটা কি তোমার খুব পছন্দ হইছে। সে কয় খুউব।

তারে কইলাম সামনে সময় আসতাছে এইখানে আসবার। সে কয় কেন। তারে কইলাম এই বিশাল প্রান্তর থাইক্যা তোমাকেও কিঞ্চিত প্রদান করা হইবে ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টর জন্য। তাহা পরিচর্যার জন্য তোমাকে প্রায়শই আসিতে হইবে । দেখলাম তার চোখে ঝিলিক দিয়া উঠলো আনন্দ। তাহার আনন্দেই আমার আনন্দ।

সন্ধ্যার দিকে হলে ফিরিয়া আসি।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৩ শে আগস্ট, ২০০৮ দুপুর ১:০৬

অপেক্ষায় থাকি কবে দেওয়া হইবে সেই প্লট বা জমি যাহাতে শস্য উৎপাদেনর মাধ্যমে আমাদের কৃষক সত্তা বিকশিত হইবে (আসলেই কি তাই নাকি তার সান্নিধ্য লাভের আশা)। একদিন অপেক্ষার পালা শেষ হয়। জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ছোট একটুকরা জমি। হাল চাষ করাই আছে।

কাজ শুধু

বীজ বপন ।
সেচ প্রয়োগ (তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাম্প থেকে অটোমেটিক দেওয়া হইতো)
পরিচর্যা (আগাছা দমন, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি)
ফষল সংগ্রহ।
রিপোর্ট প্রদান।

পরম মমতায় কৃষকের কষ্ট অনুধাবন করিয়া, কাঠফাটা রোদ্রে ঘর্মাক্ত হইয়া, কাদা মাটিতে একাকার হইয়া ধানের বীজ বপন করিয়া পরিপূর্ন কষকের ভাব ধরিলাম (সেই ভাবটা এখনও ধরিয়া আছি)। কারণ মাষ্টর সামনে দাড়াইয়া ছিল।

যাইহোক ফষলে জমিতে বীজ বপন সম্পাদিত হইলো। এখন পরিচর্যার পালা। অবশ্য এইসব পরিচর্যা অন্যদের মতো ফার্মের মামু দের দ্বারা সম্পাদন সম্ভব। কিন্ত আমরা তাহা করিলাম না। কারণ এই জায়গায় আসার জন্য এর চেয়ে ভালো অজুহাত আর কেউ বাহির করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

এর পর থেকে প্রায় দুপুরে আমরা দুই কৃষক কিষাণী এখানে এসে ফষলে পরিচর্যা করতে লাগলাম। সেই ফাকে অবসরে এই নির্জন প্রান্তরে দুই কৃষক কিষাণী তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার কাজও সম্পাদন করতে লাগলো।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৮ শে আগস্ট, ২০০৮ রাত ১১:৪৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১১

প্রিয় পাঠক,

আপনাদের প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। একদিন খেয়ালের বশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম সিরিজটি শুরু করি। আপনাদের ভাল লাগা দেখা আমি মুগ্ধ। পাঠক হলো কোন লেখার সঠিক বিচারক।

লেখতে লেখতে খেয়াল করলাম আমি শুধু আমার মনের কথাগুলিই বলতে পারছি। কিষাণী মনের কথাগুলি ঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তাই কিষাণীর দ্বারস্ত হলাম। সে তার মনের কথাগুলি বলতে রাজী হলো।

এই সিরিজে কৃষক এবং কিষানী দুইজন মানুষ। তারা তাদের স্মৃতিচারন করবে একই নিকে। দেখুন কাহিনী যায় কোথায়। আশাকরি সঙ্গে থাকবের পূর্বের মতো। ভালো লাগলে জানাবেন খুশী হবো। খারাপ লাগলে বলবেন শুধরে নেবার চেষ্টা করবো।

আপনাদের আবার ধন্যবাদ

কৃষক

কিষাণীর স্মৃতি থেকে (১)

দিনগুলি মোর

স্মৃতির পাতায় যে ছবি আকাঁ আছে, সময়ের পথ পরিক্রমায় তাতে ধুলোবালি পড়েছে, অথবা ঝাপসা হয়ে গেছে অনেক ঘটনা। অথবা ঘটনার পরম্পরা এখন আর সাজানো যাচ্ছে না। তারপরও এতদিন পাঠক কৃষকের স্মৃতিচারণ পড়েছেন। কৃষকের লেখনির সাথে পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি কিষাণিও পৌঁছে গেলাম সেই সোনাঝড়া দিনগুলোত। আপনারাও না হয় চলুন আমার সাথে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সবার জন্যই একটি স্বর্ণালী অধ্যায়। তারুণ্যে ভরপুর সেই দিনগুলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সমস্ত জীবনে এত সুন্দর সময় আর আসবে না। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। আনন্দ, উল্লাস, উচ্ছলতা ভরা ছিল সেই দিনগুলো; সেই সাথে ছিল অকারণ অভিমান, তীব্র কষ্ট, বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া বিকেল-সন্ধ্যা, নির্ঘুম রাতের নীরব কান্না; তারপরও, আহা আমার সোনার খাঁচার দিনগুলি। অনেক প্রাপ্তি ছিল, ছিল না পাওয়ার কষ্ট। এই বুঝি জীবন, জীবনের সহজ এবং কঠিন সমীকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বছর আমাকে পূর্ণ করেছে, আলোকিত করেছে, পরিণত করেছে। যাকে পাথেয় করে আজকের আমি পথ চলছি।

আমার এই পথ চলা এত মধুর, এত পূর্ণ কখনোই হতো না, যদি না আমার জীবনে তার আগমন ঘটতো। কার? পাঠকের চিরচেনা সেই কৃষক এর। এত বছর পর এই লেখার সুবাদে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে রাখি। ও ছিল বলেই আমি জারুল, রাধাচূড়া, চালতা গাছ চিনেছি, চিনেছি নাম না জানা আরো কত ফুল পাখি।

প্রতিটি কাজে সে ছিল আমার সাথী, তাই আমার যা কিছু প্রাপ্তি তাতে তাঁর অবদান অনেক অনেকখানি।

কৃষক মশাই আমার সাথে তাঁর প্রেম কে বিষবৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বিষবৃক্ষ উপন্যাস এর একজন বিশেষ অনুরাগী। আমি তা করতে চাই না। যে প্রেম আমাকে পূর্ণ করেছে, আনন্দে ভাসিয়েছে, বেদনায় নীল করেছে; তাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করি। সে প্রেমের কাছে আমি নতজানু।

ইতিমধ্যে এর শুরুটা সকলের জানা: সেটি কৃষকের অনুভূতি, এবার কিষানীর অনুভূতিগূলো বলতে চাই; আশা করি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না।

অপেক্ষায় থাকুন......

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৯ শে আগস্ট, ২০০৮ রাত ১১:৫৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম-১২

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-২
তোরা যে যা বলিস ভাই

আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ে যখন পরিবারের শাসন বারণ এর বেড়াজালের গন্ডি পেরিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার পথে পা রাখলো, তখন তার চোখে মুখে শুধু বিস্ময় আর মুগ্ধতা। অজানাকে জানার আনন্দ।

মেয়েটি চঞ্চল, প্রানোচ্ছল,অস্থির: সিনিয়রদের সাথে বেশ ভাব, বান্ধবীদের সাথে বন্ধুত্বের বাইরেও একটু যেন মাতব্বরী ভাব।

ছেলেটি ভীষণ দুষ্টু, প্রাণবন্ত, উচ্ছল, বোহেমিয়ান এবং অসম্ভব মেধাবী। সহপাঠি এবং সিনিয়রদের সাথে তার সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক। যে কোন কঠিন বিষয় অল্প সময়ে বুঝে যেত। দুষ্টুমি, খুনসুটিতে সারা ক্লাশ মাতিয়ে রাখতো। গলা ছেড়ে ভুল সুরে গান গাইতো, চিৎকার করে আবৃত্তি করতো। আঁতেল টাইপের বন্ধুদের নাস্তানাবুদ করতো। সহজ, সাবলীল, প্রানবন্ত এই ছেলেটি আমার সব কাজের সাথী হয়ে থাকছে এতে আমি খুউব খুশি ছিলাম। এত ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অস্থিরতার জন্য তার ভাল রেজাল্ট হতো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে আমার পড়ার চেয়ে ঘুরে বেড়ানোর দিকেই বেশী ঝোঁক। নবীনদের আগমন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা, নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ানো এসবই হল মূল কাজ। উপরন্তু এখানকার পড়াশোনার স্টাইল SSC, HSC র মত না। কাজেই ক্লাশের পড়া, assignment, periodical পরীক্ষার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এহেন অবস্থায় নীরস assignment এর ভুতটিকে নিয়ে আমার যখল বেহাল অবস্থা তখন ত্রাণকর্তার মত আবির্ভূত হলো বন্ধুটি, যে আমার পাশে বসে ক্লাশ করে, পাশাপাশি রোল। কিভাবে, কোন কাগজে, কোন স্টাইলে assignment করতে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিল, বেশ বুঝতে পারলাম ও আমাকে একসাথে assignment করতে না ডাকলে আমার নাকানি চুবানির একশেষ হতো! অবশ্য আমি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব নিয়ে বসেছিলাম, যেন আমি সব বুঝি, ওরা বলল তাই অগত্যা ওদের সাথে বসলাম।

মনে মনে আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম, বুঝলাম সে সিনিয়রদের কাছ থেকে এগুলো আগেই জেনে নিয়েছে; উদাসীন আমি যার কিছুই করিনি। আমি কি আর তাকে ছাড়ি, আঠার মত লেগে রইলাম; কে জানতো তাকে ছাড়া আমার আর চলবেই না! শুরু হল আমাদের একসাথে পড়াশোনা।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি মেয়ে চাইলেই যা খুশী করতে পারে না। ইচ্ছে মতো একা একা ঘুরতে পারবে না, সমাজের চোখরাঙানী এড়াতে তার অতি অবশ্যই একজন সংগী লাগবে। চোখেমুখে অনাবিল আনন্দ আর বিপুল বিষ্ময় নিয়ে আমি যা দেখতে চাই, উন্মোচন করতে চাই, সে জন্য আমার একজন সাথী লাগবে।আমি বেশ বুঝলাম আমার অতীব ভাল বান্ধবীরা আমার এহেন এডভেঞ্চার এ কাজে আসবে না। অগত্যা বোহেমিয়ান এই বন্ধুটি হলো আমার ভরসা। যখন তখন, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে তার কোন ক্লান্তি নেই। আর যায় কোথায়, আমার দুটো মানিকজোড় হয়ে সারাদিন ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে এবং শেষে সারা ক্যাম্পাস এর এমাথা ওমাথা!

মাঝে মাঝে ও হলে আমাকে ডাকতে এলে হাতে করে ফুল নিয়ে আসতো। আমার সিনিয়ির রুমমেট এর প্রশ্ন ফুল কে দিল? আমি বল্লাম বন্ধু দিল। সিনিয়র কপাল কুঁচকালেন, বল্লেন হুম, শুধু বন্ধুতো মনে হয় না! এভাবেই কিন্তু সব হয়। আমি অতি কনফিডেন্ট, বলি কিচ্ছু হবে না।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০২ রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সকাল ১১:২১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১৩

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-৩

শুরু হল তার সাথে পথচলা। ক্লাশ, লাইব্রেরী, মাঝে মাঝে বিরতি, টিএসসিতে চা খাওয়া, পড়ন্ত বিকেলে নদীর পাড় বা বোটানিকেল গার্ডেনে বসে থাকা। শুরুতে আমরা অনেক গুলো বন্ধু একসাথে ঘুরে বেড়াতাম, ধীরে ধীরে আমরা দু'জনে এসে ঠেকলাম।

আগেই বলেছি সে ছিল মেধাবী, সেইসাথে ফাঁকিবাজির যত কৌশল আছে তা ছিল তার নখদর্পনে। এই ফাঁকিবাজির কৌশল সে বহুবার ব্যবহার করেছে বাকী দিন গুলোতে। ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে যিনি ডেমোনস্ট্রেশন করাতেন তাঁকে সবাই খুব ভয় পেতাম, রিডিং না মেলা পর্যন্ত ছুটি নেই। আর ও বলতো দাঁড়াও ঝটপট রিডিং নিয়ে নিব, নিত ও তাই। আর সরল দোলকের প্র্যাকটিক্যাল এ আমাকে বলতো তুমি চুপ করে বসে থাকো আমি উল্টা দিক থেকে রিডিং মিলায়ে দিব, দ্রুত রিডিং নিয়ে খাতায় স্যারের সই করিয়ে দেড় ঘন্টার ক্লাশ আধঘন্টায় শেষ করে দে ছুট । পাশেই বোটানিকেল গার্ডেন, এত কৌশলে যে একটি ঘন্টা বাঁচানো হল সেটি সেখানে বসে বা ঘুরে সদ্ব্যবহার করা হত।

বড় বড় পাতার একটি গাছ আমি বল্লাম এটা কি গাছ? ও বলে ওমা তুমি চালতা গাছ চিনো না? আমি বলি চালতা গাছ এত সুন্দর! এত সুন্দর পাতা! তারপর দেখি তাই তো গাছে তো চালতা ঝুলে আছে, পরদিন অবশ্য ও আমাকে লোক দিয়ে চালতা পেড়ে দিয়েছিল চালতার আচার বানিয়ে খাওয়াবো এই শর্তে। হাটতে হাটতে নানা কথা যার কোনটারই কোন মাথামুন্ডু নেই। এমনি করেই ও আমাকে চিনিয়েছিল জারুল ফুল, হালকা বেগুনী এই রঙটা আমার আগে থেকেই প্রিয়। এই ফুলটার এত সুন্দর নাম দেখে আমি আরো মুগ্ধ! দিনে দিনে আমি আরো চিনলাম রাধাচূড়া, মে ফ্লাওয়ার, হিজল গাছ; চিনলাম কাঁঠালীচাঁপা, স্থলপদ্ম; কিছু কিছু ফুলের নাম আমি জানতাম ও সেগুলোর ভুল নাম বললেই শুরু হত হৈ চৈ।

এ যেন এক রুটিন শুরু হল। আমার সিনিয়র রুমমেটেরা পিচ্চি ছোট বোনটাকে সারাক্ষন উপদেশ দিতেন, তোমাকে ফার্ষ্টক্লাস পেতে হবে। আমি ভাবতাম এ আর এমন কি? ছুটির দিনগুলোতে আমার সিনিয়র রুমমেটদের শাসনে সকালের নাস্তা শেষে পড়তে বসতে হত। সকাল দশটা সাড়ে দশটা হলেই হলের গার্ডরা ডাকতেন , আপা আপনার গেস্ট। আমার যেন কানটা খাড়াই ছিল, সাথে সাথে উত্তর দেই, আসছি। আমাদের তিনতলার করিডোরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তা দেখা যেত। সেখানে দাড়িয়ে দেখতাম বন্ধুটি এসেছে, ও বলতো নিচে আসতে, আমি ইশারায় বলতাম আসছি পাঁচ মিনিট। তড়িঘড়ি তৈরী হয়ে নীচে। সোজা নদীর পাড়, বেশ কিছুক্ষন ঘুরেটুরে হলে ফেরা এবং বিকেলে যথারীতি আবার টইটই করে ঘোরা।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০২ রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ রাত ৯:৩০

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১৪

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-৪
আমি কান পেতে রই

বন্ধুটি যখন আউরাতো হেলাল হাফিজ, কেউ কথা রাখেনি অথবা কথোপকথন, মাঝে মাঝে আমিও সুর মেলাতাম: নান্দনিকতার বিচারে তার হয়তো তেমন মূল্য নেই, তবু আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতাম। আমি তার মাঝে খুঁজে পেতাম বিপুল প্রাণশক্তি, সে যেন এক ছুটে চলা ঝরণা, থামতে জানে না শুধু ছুটে চলে। আমি সেই ঝরণাকে ছুঁয়ে দেখতে যেয়ে নিজেই ভেসে গেলাম, আমার আর কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকেনি।

আমার কাছে তাকে মনে হত একটা পাগলা ঘোড়া, অস্থির, চঞ্চল; যাকে বশে রাখা খুবই কঠিন - পরে বুঝেছি আসলেই কত কঠিন! তবু এই পাগলা ঘোড়াটা যখন আমার কাছে থাকতো তখন বড্ড শান্ত, চুপচাপ; যেন বশ মেনেছে। তার প্রতি গভীর মমতায় আমার মন ভরে উঠতো। মন বলতো আহারে পাগলাটা!

ক্লাশে সে আমার পাশে বসতো নইলে ঠিক পিছনে। সারাক্ষন দুষ্টুমি, এই কমেন্ট করছে, নয়তো চিরকুট লিখে আমাকে দিচ্ছে। আমি আবার বরাবরই ক্লাশে খুব সিরিয়াস, তারপরও তার এসব দুষ্টুমিতে ফাঁকে ফাঁকে অংশ নিতাম।

এত হৈচৈ, দুষ্টুমি, আনন্দে দিন কাটতে কাটতে কখন যে আমার মনে রঙ লাগলো, চোখে নেশা লাগলো বুঝতেই পারিনি। আমি কো-এডুকেশন স্কুল কলেজে পড়া মেয়ে, ছেলেবন্ধুদের সাথে মিশতে আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া কখনো হতো না। আমি দেখতে নেহায়েত মন্দ না, তবু কোন তরুনের মুগ্ধ চোখের দিকে আমি ফিরেও তাকাতাম না। আমি একটু উদাসীন টাইপের, রমনীসুলভ ছলাকলা, ন্যাকামি কম জানি। আমি চেয়ে থাকি, তবে লক্ষ্য করিনা।

এই রকম যে আমি, সে কিনা এই পাগলা ঘোড়াটার দিকে লক্ষ্য করা শুরু করলো! আগে একবার বলেছি তার সব পাগলামি, দুষ্টুমি আমার ভাল লাগতো, মজা লাগতো।এখন আরো কিছু নতুন ব্যাপার যোগ হল। যখন পাশাপাশি বসে পড়তাম তখন চোখে চোখ পড়লে বুকের মধ্যিখানে শুনতে শুরু করলাম নূপুরের রিনিঝিনি। এই ঝংকার আরো হত যখন ক্লাশ করার সময় দৃষ্টিসীমায় তাকে দেখতাম অথবা করিডোরে দুর থেকে তাকে হেঁটে আসতে দেখতাম। বুকের ভেতরকার এই সুখের কাঁপন আমি সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম, কান পেতে শুনতে লাগলাম নূপুরের সেই ঝংকার।

আমার একবারও মনে হযনি এটা কেন হয়, কেন হচ্ছে, ভাল কি মন্দ হচ্ছে! আমি শুধু জানি আমার ভালো লাগে। আমি মোহাবিষ্টের মত জড়িয়ে পড়ি , আমর মন মস্তিস্ককে কোন প্রশ্ন করার সুযোগই দেয় না।

০৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ দুপুর ১২:০৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১৫

কিষাণীর স্মৃতি থেকে - ৫

যখন বুঝতে পারি তখন যা হবার তা হয়ে গেছে। ভীষন ভাললাগায় আমি আচ্ছন্ন। আমার রুমমেটেরা যখন বলে বন্ধু ফুল দিলে তো অন্য কিছু হবে, আমি বড়াই করে বলি কিচ্ছু হবে না, তবে আমার মন খুশীতে ডগমগ করে ওঠে; কি জানি আমার চোখেমুখেও তার কিছুটা ধরা পড়ে কিনা, রুমমেটেরা আর কিছু বলেন না। আমার কি ছাই এত কিছু ভাবার সময় আছে!

আমি নিজেকে সাজাই, পরিপাটি করে সাজাই তার চোখে মুগ্ধতা দেখবো বলে। যখন দেখি সে চোরা চাহনিতে আমাকে দেখে, না তাকিয়েও আমি তা উপলব্ধি করি। ভাললাগায় ছেয়ে যার আমার মন। আমি বুঝতে পারি এই বন্ধুত্ব এখন আর বন্ধুত্ব নেই। কিন্তু তারপরও আমি এই ভাললাগার হিসাব মেলাতে চাই না। কেন যেন এই সুখের আবেশ ছেড়ে আমি বের হতে চাই না। নিজের সাথে চলে আমার লুকোচুরি খেলা।

এভাবে দিন যায় তার দৃষ্টির মুগ্ধতা আরো তীব্র হয়, মাঝে মাঝে সে সাহসী হয়ে চোখে চোখ রাখে এবং দৃষ্টি সরিয়ে নেয় না। মনে মনে ভাবি খুব সাহস দেখানো হচ্ছে! তার প্রতি ভাললাগায় আমি আকন্ঠ নিমজ্জিত, একই অনুভূতি যে তারও হচ্ছে, রমণীসুলভ ইনট্যুশন থেকে আমি তা বেশ বুঝতে পারি।

ভরাডুবি না হলে বুঝি বোধোদয় হয় না! তাই যখন ভরাডুবির একশেষ তখন আমার মস্তিস্ক সচেতন হয়ে উঠল। সে বলতে শুরু করল কত ভরসা করে তোমাকে তোমার অভিভাবক এত দুরে তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছে, আর তুমি কিনা মূল কাজ বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখায় বিভোর! এক জটিল বাঁধনে জড়াচ্ছো! এর মানে বোঝো? কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। দু তিন বছর পর যখন অভিভাবক বলবেন উঠ ছুড়ি তোর বিয়ে তখন তোমার এই পাগলাকে তুমি কি বলে তাদের সামনে দাঁড় করাবে?

শুরু হল মন এবং মস্তিস্কের যুদ্ধ। মন বলে তাতে কি আমরা দু'জন মিলে খুব ভাল রেজাল্ট করবো তাহলে অভিভাবকদের সামনে দাঁড়াতে কোন সমস্যা হবে না। মস্তিস্ক বললো এখনো সময় আছে সাবধান হও এবং ফিরে এস। মস্তিস্ক জয়ী হল। মন সরে আসতে মসস্থির করলো ।

ভাবা আর করা তো এক কথা নয়। তার কাছে গেলে তো আর অতশত যুক্তি মনে থাকে না। তাকে ছেড়ে থাকার পথ ও বন্ধ, সব কাজ করতে হয় একসাথে। আমি ভেজা খোলা চুল মেলে দিয়ে পথ চলি সে পাশ থেকে বলে, তোমার চুলে মিষ্টি গন্ধ; আবার আমার বুকের কাঁপন শুরু হয়, মস্তিস্ক হার মানে। পরে একদিন ও বলেছিল, তোমার চুলে কাঠালীচাঁপার গন্ধ এটা কিভাবে হল। ওর মাঝে একটা রোমান্টিকতা কাজ করতো, ভাবতো ভালবাসলে বরুনার বুকে আতরের গন্ধ, আর আমার চুলে কাঠালীচাঁপার গন্ধ। বেরসিক আমি বলে দিলাম কারো চুলে কোন গন্ধ থাকে না, এটা আমার শ্যাম্পুর গন্ধ। প্রথমে কিছুটা দমে গিয়েছিল, তারপরও যখনই খোলা চুলে সেই গন্ধটা পেত, ও আমার পিছু পিছু হাঁটতো চুল শুঁকবে বলে। আজো ভাবতে কি ভাল লাগছে!

আমি জড়িয়ে পড়েছি, ফিরে আসার পথ বন্ধ। দিনের বেলা মনে হয় অসম্ভব তাকে ছেড়ে থাকা। আর রাতে মনে হয় তাকে ছাড়তে পারতেই হবে। নির্ঘুম রাতে হাজারো পরিকল্পনা করি, কোনটাই মনঃপুত হয় না। অনুভব করতে পারছি তার অস্থিরতা; অন্য এক ক্লাশমেটকে বললাম কি করা যায়, ও তো মনে হয় আমার প্রতি দূর্বল, নিজের মনের অবস্থা আর বললাম না, চেপে গেলাম।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ দুপুর ১২:০৫

যথারীতি যা ঘটবার তা ঘটল, ও আমার সাথে রহস্য করে বললো, আমি চিন্তা করে দেখলাম আমি একটা মেয়ের প্রেমে পড়ছি, আমি চুপ করে আছি, আজ আমার ভরাডুবি। ও আবার বললো, জানতে চাইলা না মেয়েটা কে? আমি মনে মনে বলি, আমি আর জানিনা! দ্রুত ভাবছি এখন কি বলবো। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও বললো, সে মেয়েটা হচ্ছো তুমি। আমি ভালবাসি। আমার মন বলছে, আমি হয়তো তোমার চাইতেও অনেক বেশী ভালবাসি; মুখে তা বলতে পারলাম না। বললাম এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। আমার পক্ষে সম্ভব না। মনের অব্যক্ত কথা কান্না হয়ে ঝরে পড়লো। ও বলে কেন সম্ভব না? আমি তো জানি আমার কাছে কোন যুক্তি নেই, বেশি কিছু বলতে গেলে আমি ধরা পড়ে শেষ। তাই এক কথা, সম্ভব না।

আমি দেখছি ওর মুখটা কষ্টে শুকিয়ে গেল, মায়াভরা চোখগুলোতে বিষন্নতা। আমি প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে ব্যাস্ত। পরদিন ও বলল আমার ধীরে ধীরে সরে যাব, এখন আগের মত স্বাভাবিক থাকো। হঠাৎ কথা বন্ধ করলে সবাই বুঝবে আমাদের মধ্যে কোন ঝামেলা হয়েছে। আমি ভাবলাম যাক বাবা এযাত্রা তো বাঁচলাম।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সকাল ৯:০৫

বিশ্বিবদ্যালয়ের প্রেম - ১৬

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-৬

আগে ভেবেছিলাম যাক বাবা এ যাত্রা বাঁচলাম। কি যে বাঁচলাম তা দু'দিনেই বুঝলাম। ও আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আগের চাইতে স্বাভাবিক আচরন করে, আরো বেশী হৈচৈ করে। আর আমি কষ্টে মরে যাই। আমার মনের মধ্যে নতুন আঙ্গিকে প্রতিনিয়ত ঝড় বইছে। মাঝে মাঝে রাগ হয় কেন সে এত সহজে আমাকে মন থেকে মুছে ফেলবে, এই হল বেয়াড়া মন! তাহলে আমি কি করবো এবার তাকে বলবো যে আমিও তাকে ভালবাসি নাকি তার মত ভাল থাকার অভিনয় করবো। নিজের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা কারো সাথে শেয়ার করি। কেন যেন সমবয়সী বান্ধবীদের প্রতি আস্থা রাখতে পাছিলাম না। আমি ঢাকায় আমার কলেজের এক স্যারের শরণাপন্ন হলাম। উনি আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনেন। উনি সব শুনে বললেন তোমার মধ্যে দোটানা হচ্ছে কারন তুমি ছেলেটাকে ভালবেসে ফেলেছো, এখন তো কিছু করার নেই। আমি মনে মনে বলি আমি তো জানি ভালবেসেছি। স্যার যে বকা দিলেন না তাতে মনে একটু সাহস পেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম। এ ভদ্রলোকতো তো দেখি রীতিমত মহাভদ্রলোকে পরিণত হয়েছেন। সদা সর্বদা ১০০ হাত দুরে থাকেন, এমন অবস্থা। আমি তা হতে দেব কেন! আমি জেনে গেছি আমাদের কি হবে। এখন সে আমাকে এড়িয়ে চলে আর আমি তার পিছু পিছু। আমার আচরনে অবাক হয়ে মাঝে মাঝে আমাকে খোঁচা দেয়, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি একথা নানা রসিকতা করে বলে। মাঝে মাঝে আমি কষ্ট পাই, কখনো বা হেসে উড়িয়ে দেই। আমি তার হাস্যরসের গভীরে তার মনের কথা পড়বার চেষ্টা করি।

আমি তার প্রতিটি এক্সপ্রেশন বুঝি, বুঝি উপরে উপরে ভাব দেখানো হচ্ছে। যে অনুভূতি আমার হচ্ছে তা তার না হবার কোন কারণ নেই। অথচ আমি তাকে কিছু বলবার কোন সুযোগ ও পাচ্ছিনা। তাই এক সন্ধ্যায় যখন ফেরার পথে টি এস সির বারান্দা থেকে নামবার সময় বলল হাত ধরবা কিনা ধর, সেদিন তো মন দিলাম নিলা না। কথাটায় কোন আবেগ ছিল না। তারপরও শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। কিছু না বলে হাত ধরে নামলাম। যখন হাতটা আর ছাড়ছি না তখন তার টনক নড়লো। ও নীচু স্বরে বলল, তুমি আমার হাত ধরলা? আমি বললাম, ধরলাম আর ছাড়বো না। সে তো বেশ কনফিউজড, আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলল, আবার ধর। আমি খুব স্বভাবিক ভাবে হাত ধরে হাঁটছি। আমার খুব ভাল লাগছে, মনটা হাল্কা লাগছে। সে বলছে তাহলে ব্যপারটা কি দাঁড়াইল? আমি বলি কি দাড়াইল, কিছুই দাড়ইল না। কিছুক্ষন টি এস সির সামনের রাস্তায় পায়চারী। ধীরে ধীরে হলে ফিরে এলাম। আমাকে পোঁছে দিয়ে হলে চলে গেল।

এতদিন যা ছিল মনে মনে এখন তা দুজনের জানা হয়ে গেল। কেমন যেন একটা হতবিহ্বল অবস্থা। প্রবল ঝড়ের পর যেমন সব শান্ত নিশ্চুপ হয়ে যায় তেমনি।

ধীরে ধীরে বিহ্বলতা কাটলো। আবার সেই পুরোনো জীবন যাপন মাঝে শুধু ভাললাগা গুলোর মাত্রার পরিবর্তন। কাজের গতি, পড়াশোনায় মনযোগ বাড়লো। সুযোগ পেলে একটু রিকশায় ঘোরা, কাছাকাছি থাকার জন্য। সন্ধ্যার পর এলোমেলো হাঁটা।

সারাদিন ক্লাশ লাইব্রেরী ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যায় হলের ডাইনিংএ খেয়ে আমি দিতাম ঘুম। সাধারনত বান্ধবীরা তখন আড্ডা মারতে আসতো। এই আড্ডা এড়াতেই ঘুম থেরাপী, আমি ঘুমিয়ে আছি তাই আমার ডাক পড়তো না। ঘুম থেকে রাত এগারোটার দিকে উঠে পড়াগুলো শেষ করতাম। কারন আমাকে রেজাল্ট ভাল করতে হবে। বাবা মাকে শান্ত করার এটাই একমাত্র পথ।

আমাদের বন্ধুমহলে এখনো আমাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আপডেট করা হয়নি। তবু সেটা কারো অগোচরে থাকলো না। ফ্যাকাল্টির পিকনিকে আমাদের কমন বান্ধবী ঘোষনা দিল "এই যে এরা আমাদের ক্লাশের নতুন জুটি"। আমরা দুজন মিটিমিটি হাসি।

আর সব জুটিদের মত আমরাও স্বপ্ন দেখি, প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, ঘর বাঁধার স্বপ্ন। প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবার জন্য একে অপরকে সাহস দেই। আশায় বুক বাঁধি।

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ রাত ১:১৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১৭

কিষাণীর স্মৃতি থেকে- ৭

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি মফস্বলে হওয়াতে এখানকার পরিবেশও ছিল বেশ রক্ষণশীল। আমাদের শিক্ষকরা ছেলে মেয়েরা একসাথে আড্ডা দিচ্ছে, জুটিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এসব দেখলে খুবই অখুশী হতেন। সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হলে ফিরতে না পারলে হলের হাউজ টিউটরদের হাতে কি পরিমান যে নাকাল হতে হত! হলে থাকা মেয়েদের নিয়ে তাদের ধারনাও ছিল আপত্তিকর রকম খারাপ। অথচ এই সব শিক্ষকদের সন্তানরাই হয়তো অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে; একই রকম পরিবেশে জীবন যাপন করছে। জুটিবদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট করা কঠিন ছিল, যদিবা রেজাল্ট আটকানো সম্ভব না হত, তবু ভাল রেজাল্ট করা সত্বেও শিক্ষকতা নামক চাকরীটি পাওয়া দুস্কর ছিল যাদের গায়ে প্রেমিক প্রেমিকা গন্ধ আছে তাদের। এরকম একটা পরিবেশে আমরা কোন কিছুর পরোয়া না করে দিব্বি নামকরা জুটি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চষে ফেলতে লাগলাম।

আমি বরাবর ঢাকা শহরে জন্মানো এবং বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে। ইট, কাঠের দালানের মধ্যে বড় হয়েও প্রকৃতির প্রতি আমার এত মমতা তৈরী হয়েছিল বোধহয় বই এবং পত্রিকা পড়তে পড়তে। আমি এর আগে কাশ ফুল দেখেছি টিভিতে অথবা ক্যালেন্ডারের পাতায়, বাস্তবে এর দেখা আমি আগে পাইনি। প্রথম যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসি, আমার পিঠাপিঠি বড় ভাই এবং আমি খুব ভোরে ঢাকা থেকে বাসে করে আসি। আসবার পথে ক্যাম্পাসে ঢোকার আগে দেখি নদীর বিস্তির্ন চর জুরে সাদা কাশের বন, আমি তো মুগ্ধ বিস্ময়ে শুভ্র কাশবন দেখছি, পরীক্ষার পড়া টড়া মাথা থেকে উধাও। ক্যাম্পাস দেখে আমি আরো মুগ্ধ, এত শান্ত, এত সুন্দর! যেন ছবির মত সাজানো। এখনো যখন যাই আমার এক অদ্ভুদ প্রশান্তি আসে মনে। মনে মনে তখন বলেছিলাম এখানে পড়তে হবে। এই প্রিয় ক্যাম্পাস, যেখানে প্রকৃতির রূপ রঙ চারিদিকে ছড়ানো, সেখানে চুপ করে ঘরে বসে থাকা যায়! আমার পক্ষে তো তা অসম্ভব। আমি যখন ই সময় পাই, ঘুরে বেড়াই। প্রিয় প্রকৃতি আর প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য আমার জীবনকে আরো ভরিয়ে তোলে।

শরৎকালে নদীর তীরে যেমন কাশফুল ফোটে, তেমনি ঘাসেদের বুক চিরে ফোটে ঘাসফুল। এই ফুলগুলোকে আমি বলি ঘাসফুল, আসলে কি নাম কে জানে! এগুলো পরে চোরকাঁটা বা প্রেমকাঁটা হয়। আমরা দু'জন যখন পড়া শেষে বিকেল বেলা, অথবা ছুটির দিনে নিঝুম দুপুরবেলা টি এস সির পিছনে বসে বসে কত কত কথার ফুলঝুরি ফোটাই; তখন যেদিকে দুচোখ যায় মাঠজুড়ে শুধু ঘাসফুল, কি যে অপূর্ব দেখতে! সারা মাঠ সাদা গালিচায় মোড়ানো, আমার ইচ্ছে হত ঐ সাদা মখমলের মত ফুলের ওপর গড়িয়ে আসি। কত যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম; অকারনে চোরকাঁটার ওপর দিয়ে হাঁটতাম। আর বসে বসে গপ্প করার ফাঁকে ফাঁকে চোরকাঁটা বাছতাম।

আরো এক বিস্ময় ছিল জোনাকী। একটু গ্রাম গ্রাম হওয়াতে রাস্তার বাতিগুলো তে খুব আলো হত না। যেখানে একটু আলো কম, ঝোপের মধ্যে দেখতাম ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী। সে যে কি অসম্ভব সুন্দর। মনে হত বিয়ে বাড়ীর আলোক সজ্জা, আমি খুশীতে আত্মহারা হয়ে যেতাম, ওর হাত ধরে বলতাম দেখো দেখো কি সুন্দর। আমার সব আনন্দ সব উল্লাসে তার ছিল নিঃশব্দ সমর্থন। আমার সব ছেলেমানুষী শখকে বিনা প্রশ্নে পূরন করতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ রাত ১:১৯

অন্য সবার মত আমারো পূর্ণিমা ভীষণ পছন্দ। আমার মত ছন্নছাড়া, ভাবুক টাইপের মেয়ের ফুল, পাখি, কবিতা, চাঁদ ভালো লাগবে এ আর এমন কি! তবে এতদিন শহরের দালান কোঠার মাঝে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখেছি। ক্যাম্পাসের পূর্ণিমা না দেখলে চাঁদের সাথে এত প্রেম আমার হত কিনা সন্দেহ!

আমরা দ'জন এক পড়ন্ত বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। ঝিরঝির বাতাস বইছে, কি যে ভাল লাগছে। আমাদের নদীটার পুবদিকে বিস্তীর্ণ চর, অনেক দুরে গ্রামের ক্ষীণ রেখা দেখা যায়।পশ্চিমাকাশে সূর্য তখন ঢলে পড়ো পড়ো। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি পুবাকাশে বিশাল চাঁদ ধীরে ধীরে উঠছে। এরপর আমি লক্ষ্য করেছি পূর্ণিমাতে একদিকে সূর্য ডোবে আর একদিকে চাঁদ ওঠে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে, বিশাল সোনালী চাঁদ পুবের আকাশ বেয়ে উপরে উঠে আসছে। সোনালী আলোয় ঝলমল করে ইঠছে চারপাশ। নদীর টলটলে পানিতে সোনালী আলোর ঝিলমিল খেলা। যেন কালো মসলিন শাড়ীতে সোনালী সুতোর কারুকাজ। আমি হতবিহ্বল, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমরা সব সময় বলি রূপালী চাঁদ, কিন্তু একদম সন্ধ্যায় চাঁদ সোনালী থাকে, ধীরে ধীরে রাত বাড়ার সাথে রূপালী হয়। মুগ্ধ আবেশে আমরা দীর্ঘ সময় পাশাপাশি হাত ধরে বসে এই অপূর্ব প্রকৃতি দেখি। আমাদের হলে ফিরতে ইচ্ছে করেনা। তবু হলে ফিরে বকা খাবার ভয়ে হলে ফিরি। আমি হলে ফিরেও ছাদে বসে চাঁদকে দেখি, সোনালী চাঁদ রূপালী হয়, আমি জোৎস্নার সাগরে ভাসি। গভীর রাতেও আমি ঘুম ভেঙ্গে জোৎস্না দেখি। মাঝরাতে জোৎস্নাকে আমার কেমন অশরীরী মনে হয়। গা ছমছম করে ওঠে। জোৎস্নার সাথে আমার এক অলিখিত প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমি পরে একদিন তাকে বলি, সেদিন নদীর জলে আমার জোৎস্নার খেলা দেখা হল না। আমি মেয়ে বলে আমাকে হলে ফিরতে হল। যদি আমি ছেলে হতাম, মাঝরাত পর্যন্ত নদীর ধারে শুয়ে থাকলেও কেই আমাকে কিচ্ছু বলতো না। সে বললো ঠিক কথা। আমি তাকে বললাম আমার খুব ইচ্ছে করছে পুরো একটি পূর্ণিমার রাত আমি আমি নদীর উপরে নৌকাতে থাকবো। সারারাত জোৎস্না দেখবো। তুমি আমার এই শখটা পূরণ করবে? আমি জানি আমার শখটা যতটাই রোমান্টিক ঠিক ততটাই অনিরাপদ। আমাদের দ'জনের কারোরই এতটা সাহস নেই এখনই এই এডভেঞ্চারটি করবার। তাই আমরা ঠিক করলাম আমাদের যখন বিয়ে হবে তখন কোন নিরাপদ পরিবেশে আমরা দু'জন সারারাত নদীর জলে জোৎস্না দেখবো।

আমার এ সাধের স্বপ্নটা আজো পূরন হয়নি। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে অনেক ব্যবধান থাকে। সময় হয়নি, সুযোগ হয়নি। তবে স্বপ্নটা এখনো আছে। এখনো আমি ভাবি একদিন ছেলেপুলেরা বড় হবে, সংসারী হবে। তখন আমার দায়িত্ব ফুরাবে, মুক্ত হব আমি। হয়তো একদিন শুভ্রবসনে, কাশফুলের মত সাদাচুলের বুড়োবুড়ি জোৎস্নায় স্নাত হবে, নদীর জলের উপর, মুখোমুখি বসে। আমাদের কন্ঠে গুনগুন করবে প্রিয় গান, দ'জন মিলে আবৃত্তি করবো প্রিয় কবিতা। প্রিয় মানুষটির কানের কাছে চুপিচুপি আমি বলবো অনেক দিনের একটা শখ আজ আমার পূরণ হল, আজ আমার মরেও সুখ।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ রাত ১২:৪৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ১৮

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-৮

আমরা যখন ফার্ষ্ট ইয়ারের শেষের দিকে তখন এক ব্যাচের সমাপনি উৎসব হবে। এর আগে তো এরকম অনুষ্ঠান দেখিনি। তাই সব কিছুতেই খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নানারকম সাজসজ্জা, অপূর্ব সব অনুষ্ঠান, মজার মজার প্যারোডি গান, কয়েক দিন ধরে প্রোগ্রাম সব এক্কেবারে বড় বড় চোখ করে দেখছিলাম।

সবচেয়ে ভাল লাগছিল সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হলে প্রবেশ নীতিমালার সাংঘাতিক রকম শিথিলতা। ইচ্ছেমত হলে ঢুকতে পারছি, গেটে দারোয়ান ভাইরা জিজ্ঞ্যেস করলেই বলছি অনুষ্ঠানে ছিলাম। আহা কি আনন্দ।

এত আনন্দের অন্যতম হেতু অনুষ্ঠান দেখা ছাড়াও দু'জনের কুটুস কুটুস কথা আরো দীর্ঘসময় ধরে চালানোর সুযোগ পাওয়া। যদিও কথার কোন আগামাথা নেই, নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই, তারপরও কথা ফুরাতো না, কি যে এত বলতাম আজ মনেও নেই!

তো একদিন রাতে অনুষ্ঠান হচ্ছে, অনেক লম্বা প্রোগ্রাম, আমরা গান বাজনার মধ্যে অডিটোরিয়ামে বসে কথাবার্তার বেশী সুবিধা করতে না পেরে বাইরে বসে গল্প করার মনস্থ করলাম। বাইরে এসে দেখলাম আরো অনেক জুটিই বাইরে বসে আছে। আমরা আস্বস্ত বোধ করলাম, বসলাম লাইব্রেরীর সামনের রাস্তায়, যেটা অডিটোরিয়ামের কাছে। যাতে করে অনুষ্ঠান কখন শেষ হয় তা বুঝতে পারা যায়।

এত রাতে বাইরে বসার সুযোগ পেয়েছি, বেশ অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। আমরা বসে আছি, এমন সময় ও বলল আমার জায়গায় ও বসবে আর ওর জায়গায় আমি। আমি তো এর কারন বুঝতে পারছি না, কারন না বললে উঠব না। বলল, আগে উঠে জায়গা বদল কর তারপর বলি। হার মানলাম, জায়গা বদল হল। তখন বলল, আমি বসেছি চাঁদের দিকে পিঠ দিয়ে তাই চাঁদের আলো আমার মুখে পড়ছিল না। সে চাঁদের আলোতে আমাকে দেখবে। আহা আমি তো মুগ্ধ। এ ভদ্রলোক এমন এক মানুষ, জীবনে কখনো আমার সৌন্দর্যের প্রসংশা মুখ ফুটে করেনি। অন্য কোন পুরুষ হলে আমাকে নিয়ে নির্ঘাত দু একটা কবিতা টবিতা লিখে ফেলতো। এহেন মানুষ যখন চাঁদের আলোতে প্রেয়সীর মুখ দেখতে চায় তাতে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় আছে?

আমি লজ্জায় লাল হলাম, চাঁদের আলোতে সে আভা হয়তো বোঝা গেল না, তবু সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কোন কথায় মন দিচ্ছিল না। ভাল ও লাগছিল আবার লজ্জাও লাগছিল। প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলল, আমরা মাঝরাত পর্যন্ত বসে রইলাম।

..................আমি সবসময় তার সাথে দিনমান বসে থাকি, তার মানে যেন কেউ না ভাবে যে আমার কোন বান্ধবী ছিল না। আমাদের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্ত বান্ধবী গ্রুপ ছিল। আমরা বলতাম ফাইভ ষ্টার। আমরা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছিলাম। আমরা সুখে দুঃখে সবসময় পাশাপাশি থাকতাম। হলের দারোয়ান ভাই এবং বুবু (হলের বুয়াদের আমরা বুবু ডাকতাম) রা আমাদের পাঁচজনকেই বেশ পছন্দ করতেন। আমাদের ছোটখাটো অন্যায় আবদার ও তারা সময় অসময়ে মিটাতেন।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ রাত ১২:৪৩

দারোয়ান ভাই এবং বুবুরা ওকেও ভালই পছন্দ করতেন, কেমন করে যেন সবাইকে সে পটিয়ে ফেলতো। রাতবিরেতে হলে এসে আমাকে ডাকতে চাইলে তারা নিয়ম ভেঙ্গে বহুবার ডেকে দিয়েছেন।

একবার একদিন আমিই তাকে রাতে হলে আসতে বললাম। বাইরে তো আর বসা যাবে না। হলের গেষ্ট রুমে আমরা বান্ধবীরা ওকে নিয়ে বসে গল্প করছি। তেমন কোন দরকারি কথা না, ও একটু পর পর বলছে এবার তাহলে যাই, আমি আবার অন্য কোন গল্প জুরে দিয়ে বলছি আরেকটু বোসো না। আমার আবদার ফেলতে পারেনা, আবার কিছুক্ষন পর বলে এবার যাই, আমি আবার বলি আরেকটু বোসো।.......এমনি করে যখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁলো, আমি ওকে বললাম, শুভ জন্মদিন। এবার তো আসল ঘটনা বুঝলো, ওর জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেব বলে আমার এত নাটক। ও মনে মনে খুশি হল, আর মুখে হাসি। স্বভাবিক হবার চেষ্টা করছে, স্বভাবসুলভ দুষ্টুমি করার চেষ্টা করছে; খুব সুবিধা করতে পারছে না। বারবার মাথায় হাত দিয়ে বলছে, হায় হায় আমি বুঝতেই পারলাম না!

আমার খুব ভালো লাগছিল ওর অপ্রস্তুত অবস্থা দেখতে। ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, আজকের দিনে তুমি এই পৃথিবীতে এসেছ তাই এই দিনটি আমার জন্যেও আনন্দের। কারন তুমি না এলে আমার জীবনটা এত সুন্দর করে রাঙানো হোতো না। আমি একথা মুখে বলতে পারিনি, বাস্তব জীবনে এত কাব্য করা যায় না। হয়তো আমার চোখে তার কিছু টা লেখা থাকতেও পারে। হয়তো কোন টেলিপেথিক ওয়েভে আমার বার্তা তার মনেও নাড়া দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল কেউ কাছে না থাকলে হয়তো ও আমাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে দিত, আমার ও ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে একটু ছুঁয়ে দিই।

কিছুই করা হয়নি, তারপরও অনেক ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ওকে বিদায় দেই। কাল যে অনেক কাজ আছে!

ওর জন্মদিনে আমাকে আরো সারপ্রাইজ দিতে হবে। ওকে না জানিয়ে শহরের ভাল বেকারী তে কেক এর অর্ডার দিয়েছি বান্ধবীরা মিলে। কাল বিকেলে টিএসসি তে আমাদের বন্ধুদের পার্টি হবে। সেখানে আমি আবার শাড়ী পড়বো, খোঁপায় কাঠগোলাপের মালা না হলে আমার সাজ পুরো হবে না। বান্ধবীরা দুপুরের মধ্যে সে ফুল এনে মালা গেঁথে রাখবে। কত কাজ বাকী। আর রাত না বাড়িয়ে ঘুমোতে গেলাম। সকালে ক্লাশ শেষে সবাই জানল বিকেলে টিএসসি তে যেতে হবে, সে ছাড়া। দুপুরে ক্লাশের পর আমি সোজা হলে, বলে দিলাম বিকেলে দেখা হবে। ফলে তার জন্য তোলা রইলো আরেক দফা চমক। সে আবার এত্ত উদাসীন কিছুই তার চোখে পড়ে না!

খুব ভাল হয়েছিল আমাদের সেই জন্মদিন পালন।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৫ ই অক্টোবর, ২০০৮ দুপুর ১:৩৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম ১৯

ছবিতে একটু স্মৃতিচারণ করলাম

এই হলে বইসা কত দিন প্রেমের পরিকল্পনা করছি

এই রাস্তার সে আমার হাত ধরছিলো।
(দুইটা ছোট দেবদারু গাছ আছে রাস্তার মাঝখানে সেই জায়গায় কোন এক সন্ধ্যাবেলায়)

সেই রাস্তার আরেকটা ছবি

অনুষ্ঠান দেখার লাইগ্যা কত অপেক্ষা করতাম

এই পথ ধরে কতদিন হেটে গেছি একসাথে

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৬ শে অক্টোবর, ২০০৮ বিকাল ৩:২৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২০

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-৯

ফাঁকিঝুকির কথা..............

আমরা ছিলাম কাঠখোট্টা সাবজেক্ট এর ছাত্র। সারাক্ষন অংক, এসাইনমেন্ট, যন্ত্রপাতি এসব ছিল মূল বিষয়। কৃষিকাজ ভিত্তিক বিষয় গুলো ছিল কম, তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে কলমে চাষবাস শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছন দিকের বিশাল এক্সপেরিমেন্ট ফিল্ডে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ হত। ওখানে বসে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় এসব যন্ত্রপাতির নাম, সব রকম আগাছার নাম শিখতাম।

আমাদের মূল ক্লাশ থেকে ফিল্ডে যেতে কোন রিকশা পাওয়া যেত না অনেকটা পথ হাটতে হত। প্রথমবার ওখানে যেয়ে তো আমরা সবাই মুগ্ধ, সোজা পথ, দুধারে আমের গাছ, অবশ্য আম গাছ গুলোতে আম ধরতে দেখিনি কখনো। আমাদের ঘোরাঘুরির নতুন একখানা জায়গা হল। একদিন বিকেলে সে আমাকে বলল আগাছা প্র্যাকটিক্যাল খাতায় লাগানোর জন্য আমাদের আগাছা খোঁজা উচিৎ এবং সেজন্য ফিল্ডে যাওয়া উচিৎ। যে কথা সে কাজ, দিলাম ছুট ফিল্ডে। বিকেল বেলার ফিল্ড সকাল বেলার মত নয়। বেশ সুনশান, নিরিবিলি, মনোরম মনে হল। আমরা আগাছা চিনলাম, স্যাম্পল নিলাম, তারপর দুজন হাত ধরে হাটলাম, খানিক্ষন মাঠের পাশে ঘাসের উপর বসে থেকে তারপর ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর এল হাতে কলমে কাজের সময়। আমরা সবাই খুব আনন্দিত এবার সত্যিকারের কৃষক হতে চলেছি। আমাদের ধান লাগাতে হবে। তখন অবশ্য বুঝতাম না সেটা কোন মৌসুম। এখন বুঝি সেটা ছিল আউশ মৌসুম, এপ্রিল-মে মাসে এটা বুনে লাগানো হয়। আমি তো মাশাল্লাহ এসব ব্যাপারে সবার চাইতে অজ্ঞ, রাজধানী শহরের মাঝে বেড়ে উঠে মৌসুম বা ফসলের ব্যাপার স্যাপার আমি কিছুই বুঝতাম না।

আমাদের প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে আমি সবেধন নীলমনি একজন মেয়ে, স্যার আমাকে বেশী মায়া করে সবার সামনের প্লটটি দিলেন, যদিও রোল নম্বরের সিরিয়ালে আমারটা পড়ে শেষের দিকে, প্রথমে তো সামনের প্লট পেয়ে খুশি লেগেছিল, পরে মনে হয়েছিল কেন যে প্রথমটা আমার হল! আমার আর কৃষকের রোল পাশাপাশি, আমাকে এগিয়ে আনাতে দুজনের প্লট পড়লো দু 'প্রান্তে। শুকনো মাঠে একটা করে কোদাল দিয়ে আমাদের মাঠে নামিয়ে দেয়া হল, তার আগে কি কি করতে হবে স্যার সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আমি কিছুই বুঝিনি। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে যেয়ে দেখি, কোপ দেয়া হয় তবে মাটি আর কাটে না; এটা যে এত কঠিন কাজ আগে কে জানতো? সাথের ছেলেরা সবাই কমবেশী পারছে, অনেকে গ্রামের ছেলে তারা আরো ভালো পারছে। আমি প্রনান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেলাম কিছু করতে, তেমন লাভ হল না। তার প্লট যেহেতু অনেক পরে সে ও কিছু করতে পারলো না।

পরে সবার কাজ শেষ হবার পর গ্রুপের সবাই মিলে আমার প্লট কুপিয়ে, মাটি ঠিক করে, মই দিয়ে, লাইন করে, তাতে ধান বীজ বুনে আবার মাটি দিয়ে তা ঢেকে দিল। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝলাম চাষবাস করা অত সোজা না। কিছুদিন পর বৃষ্টির পানি পেয়ে আমাদের ধানবীজ গজালো, আমরা আমাদের ধানচারা দেখে খুব খুশি। আমাদের ধানগাছ বেড়ে উঠতে লাগলো।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৬ শে অক্টোবর, ২০০৮ বিকাল ৩:২৯

একদিন স্যার বললেন মাঠে নাকি আগাছা হয়েছে, আগাছা বাছতে হবে। আমি আগাছা বুঝি না, ঘাস আর ধানগাছ একই রকম লাগে। আমার সঙ্গী কৃষক তো ফাঁকি দিতে পটু। আগেও একদিন বলেছি সেকথা। সে বলল কোন অসুবিধা নাই, বিকালে এর ব্যাবস্থা করে দিব। মাঠের কাছাকাছি কিছু পিচ্চি থাকে ওদের টাকা দিলে ওরা আগাছা পরিস্কার করে দিবে। ব্যাস আমার দুজন দুই পিচ্চিকে দুই প্লটের দায়িত্ব দিয়ে, কাছেই ঘাসের উপর বসে বসে বাদাম ভাজা খেলাম আর গপ্পো গুজব করলাম। পিচ্চিগুলো দুইসারির মাঝের যত ঘাস আছে সব বেছে জমি একেবারে পরিষ্কার করে দিল, আমার মনে হল বাহ আমার জমি কত সুন্দর আগাছা মুক্ত!

পরদিন স্যার জমিতে এলেন আমাদের উইডিং কেমন হয়েছে দেখতে। শুরুতেই আমার প্লট, তাই আমাকে বিশাল ঝাড়ি, "তোমার প্লট তো ঘাসে ভরা, নামো ঘাস বাছো"। কি জ্বালা, আমি দেখি আমার প্লট পরিস্কার, স্যার বলেন ঘাসে ভরা! আমি হাটু পানিতে নেমে ঘাস মনে করে যেটা তুলি দেখি সেটার নীচে ধান লাগানো, শীগগীর সেটা পুতে রেখে আরেকটা তুলি। ভয়াবহ অবস্থা, প্রথম প্লটের দুঃখে তখন কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

কিছুক্ষন পর স্যার চলে গেলেন, আমি সবাইকে বললাম আমি ঘাস আর ধান আলাদা করতে পারছি না। পারবো কেমন করে জীবনে এই প্রথম সশরীরে ধান গাছের গোড়ায় বসে আছি, এর আগে দুর থেকে অথবা ছবিতে দেখেছি। কিছু বিজ্ঞ বন্ধু বলল ঘাসের গোড়া লাল আর ধানের গোড়া সাদা; কিসের কি দেখি লাল গোড়া সহ গাছের ও গোড়ায় ধান। কিছুক্ষন এভাবে যাবার পর সে এল ত্রানকর্তার বেশে, বলল "স্যার ওখানে চলে গেছে, চল পিছন দিয়া ভাগি, এভাবে ঘাস বেছে পারবা না, আজকে আরো ভালো পিচ্চি কে কাজে লাগাবো"। বরাবরের মত তার সব ফাঁকির সাথী আমি। অতঃপর আমরা পিছন দিয়ে পালালাম, রইল পরে আগাছা পরিস্কার। আমরা ফিল্ডের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে হলে ফিরলাম, আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল যদিও। সে বছর আমার জমিতে সবচেয়ে কম ধান হয়েছিল।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১১ ই জানুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:৫১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২১

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-১০

অনেক অনেকদিন হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম এর আর কোন পর্ব দেয়া হচ্ছে না।

শুরুতে কৃষক এ কাজটা নিজে করতেন একটা সময় এসে আমার মনে হল শুধু তার অনুভূতিই বলা হচ্ছে, আমি নিজের কথাগুলো বলার তাগিদ অনুভব করলাম। তাকে বল্লাম "আমার কথাগুলো বলি"। তিনি রাজি হলেন। আমি আমার কথা বল্লাম, অনেক সময়ই একই কথার পুনরাবৃত্তি হল।

একসময় এসে মনে হল থমকে গেছি, তাকে বল্লাম "এবার তুমি লেখ"। সে রাজী হয় না, আমাকে বলে "কৃষকের নিক আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, তুমি এটা যেভাবে ইচ্ছা শেষ কর"। আমি বলি "যেভাবে ইচ্ছা শেষ করবো কেন? এটা তো আমাদের স্মৃতিচারণ, যা ঘটেছে তা ই লিখবো"। তার কথা "বেশ, তুমি তাই কর"।

আমার উপর এত বড় একটা কাজ চাপিয়ে দিয়ে তিনি বেশ আরাম করে দুরে সরে রইলেন। এতদিন খুব মজা করে লিখে গেছি, এরপর ঘাবড়ে গেলাম, আর লেখার কিছু খুঁজে পাই না। তাই এতদিন হয়ে গেল নতুন কিছু লেখা হয় না।

শুরুতে অনেকে বলতেন, "দেখবেন ধারাবাহিকটা ঝুলিয়ে ফেলবেন না"।

আমরা আমাদের এই ধারাবাহিক টা শুধু ঝুলিয়ে ফেলিনি, একেবারে মেরেই ফেলেছি বলা চলে। গত সপ্তাহে কৃষককে বলছিলাম একটা কিছু লেখ, তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন দু'একদিনের মাঝে কিছু লিখবেন; তবে লেখার কোন আলামত দেখছি না।

এবার একটু স্মৃতিচারণ করি.......................

আমাদের একটা রুটিন মাফিক জীবন হয়ে গিয়েছিল। সকাল থেকে বিকেল অবধি ক্লাশ, ক্লাশ শেষে দু'জনে টিএসসি তে বসে চা খাওয়া, তারপর লাইব্রেরীতে বসে এসাইনমেন্ট/প্র্যাকটিক্যাল খাতা রেডি করা, হল বন্ধ হবার কিছু আগে একটু হাঁটা, তারপর হলে ফেরা। ছুটির দিনগুলোতে সকালে সে আসতো, খানিকক্ষন নদীর পারে বসা, অথবা টিএসসি তে বসা, দুপুরে হলে ফেরা, বিকেলে আবার এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো। সন্ধ্যায় রিকশা করে শহরে যাওয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে বেশ দুরে ছিল, যেতে প্রায় আধঘন্টা লাগতো। এতটা সময় পাশাপাশি বসা যাবে তার অনুভূতিই আলাদা ছিল।একটু অন্ধকার হলে হয়তো হাতটাও ধরা যাবে।

কলেজ জীবনে আমি অংকে একেবারে ভালো ছিলাম না। স্ট্যাটিকস, ডাইনামিকস নিয়ে বেশ বেকায়দায় ছিলাম। অংকের রেজাল্ট ও খুব ভাল ছিল না। এখন ভাগ্যের ফেরে ভর্তি হয়েছি ইন্জিনিয়ারিং এ; যেখানে অংক ছাড়া কোন কথা নেই। ফার্ষ্ট ইয়ারে মেকানিকস পড়তে যেয়ে দেখি এটি স্ট্যাটিকস, ডাইনামিকস ছাড়া আর কিছু না। মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। আবার কলেজের বই নিয়ে বসলাম, অবাক ব্যপার এতদিন যা মাথায় ঢুকতো না তখন সেটা ভালই দ্রুত বুঝতে পারলাম। সে ছিল আবার অংকে বেশ ভাল। মেকানিকস তার খুবই পছন্দের বিষয়। চলল তার সাথে মেকানিকস পড়া, একসময় দেখা গেল সারা ক্লাশে আমরা দুজন সবচেয়ে ভাল এ বিষয়টিতে। আমাদের আশা ছিল ফাইনাল এ পাঁচটি অংকই (৫টি অংক করতে হত) আমরা পারবো। আমাদের যে স্যার পড়াতেন আমি জানি তিনি ও ওর কাছে এটা প্রত্যাশা করতেন। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত ৫ টি পারিনি, চারটি পেরেছিলাম; অবশ্য অন্য কেউ ও পারেনি।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১১ ই জানুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:৫১

মেকানিকস এ ভাল বলে সে সারাক্ষন শুধু সেটাই করতো। একসময় দেখা গেল অংকটাও ভালই জ্বালাচ্ছে। আমি পন্ডিতের মত পরামর্শ দিলাম অংকটা কোন কলেজের স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়লে কেমন হয়। কেবল কলেজ থেকে পাশ করে এসেছি তাই তার এবং আরো কয়েকজনের এ প্রস্তাবটা বেশ মনঃপুত হল। একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া গেল তবে তার বাসা শহরের এক প্রান্তে। এতে যেন আমাদের আরো লাভ হল। একটা দীর্ঘ সময় রিকশা ভ্রমনের যুক্তিসঙ্গত একটা কারন পাওয়া গেল। অন্য কিছু মিস হলেও অংক করতে যাওয়ার মিস নাই। স্যার দেখতেন আমরা দু'টিতে সবার আগে হাজির। তবে এই প্রাইভেট পড়াতে রিকশায় কাছাকাছি বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপকার হয়নি। কারণ আমরা একদম প্র্যাকটিস করতাম না, সে তো আরো না। ক্লাসের পর লাইব্রেরীতে পড়ার পর আমি রুমে এসে আবার পড়তাম, সে পড়তো না। তার তখন হলের অন্য বন্ধুদের নিয়ে দ্বিতীয় দফা আড্ডা শুরু হত। কাজেই পড়া আত্মস্থ করার কাজটি সে করতো না। এই বন্ধুদের সাথে আড্ডার মাসুল তাকে দিতে হয়েছিল খুব ভালো ভাবেই।

আমি তার সর্বক্ষনের পড়ার সাথী, চলার সাথী। তাই আমার উপর একটা অধিকার বোধ তার মাঝে জন্ম নিল। অংক পরীক্ষায় সবাই খুব হিমশিম খায়, এবং কারোই খুব ভালো হয় না। পরীক্ষার সময় তার একটাই কথা আমি যেটুকু পারি তাকে কেন দেখাই না। আমার উপর তার একছত্র অধিকার কাজেই আমি তার কথা শুনবো এটাই ছিল তার প্রত্যাশা। তবে আমি অতি ভদ্র ভীতু টাইপ এক ছাত্রী। পরীক্ষার হলে আমি কোনরকম এপাশ ওপাশ করতে পারিনা। কাউকে দেখানো বা দেখা যে কোনটা করতে গেলে আমার হার্টবিট বেড়ে যা পারি তা ও ভুলে যাবো। তাই আমি শুধু ফিসফিস করে বল্লাম, না দেখাতে পারবো না। সে তো ভয়ানক নাখোশ আমার উপর। অবশ্য বেচারা পারছিল না এটাও সত্যি। আমার একেবারে উভয় সংকট অবস্থা। পরীক্ষার পর আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। কোন খবর নিচ্ছে না। পরদিন ছুটি ছিল, অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করলাম, রাগ ভাঙ্গলো, বন্ধুরা সুযোগ বুঝে আমার উপর শাস্তি আরোপ করলো, শহরে নিয়ে খাওয়াতে হবে। তখন শহরে একটি দুটি খাবার দোকান ছিল।

আমরা শহরে দল বেঁধে খেতে গেলাম।

অংক পরীক্ষায় হাবুডুবু খেতে খেতে আমি কোনরকম পার হয়ে গেলাম আর তার রেফার্ড হয়ে গেল। ফার্ষ্ট ইয়ারের রেজাল্ট যখন বের হল জানা গেল মাত্র একটা ফার্ষ্টক্লাশ। আমরা কেউ পাইনি, এক সিনিয়র ভাই পেয়েছেন। আমাদের ফ্যাকাল্টিতে ফেল করাটা একটা সাধারন ঘটনা। তাই আমাদের সাথে অনেক সিনিয়র ভাই ছিলেন। পরে জানা গেল ফার্ষ্টক্লাশ একটা নয় তিনটা, আমি তিন নম্বর এবং আমার পড়ার সাথীর একটা রেফার্ড। থার্ড হওয়াটা আমার কাছে আশাতীত ভাল রেজাল্ট, এবং আমি জানি সে সাথে না থাকলে আমি কখনোই এটা পেতাম না।

রেফার্ড হয়ে যে লোকসানটা হল তা হল তার রোল নম্বর গেল পিছিয়ে। তবু ভাগ্য ভালো প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপটা বদল হয়নি কারন ভর্তির সময় আমার রোল ও পিছনের দিকেই ছিল। তবে ফাইনাল পরীক্ষার সময় আমরা আর একসাথে বসতে পারবো না। এটা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল, সেটা কিভাবে সামাল দেয়া হয়েছিল পরে একদিন বলবো। ....

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৫ ই জানুয়ারি, ২০০৯ দুপুর ১:৪২

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২২

প্রথম দিকে, আমাদেরই এক বান্ধবী কোন ফ্যাকাল্টিতে পড়তো এখন ভুলে গেছি, আমাদের এক বন্ধুর পুতুলের সাথে পুতুল বিয়ে দিবে। যথারীতি তার আয়োজন শুরু হলো এবং তারা মহাধুম ধাম করে পুতুল বিয়ে দিল। আমি বেশ পুলকিত, আমি তাকে বললাম চলো আমরাও পুতুল বিয়ে দেই, বর পুতুল বরযাত্রী সেজে আসবে ছেলেদের হল থেকে রিক্সা করে মেয়েদের হলে। সেখান থেকে যাবে টিএসসিতে সেখানে বিয়ে পড়ানো হবে । সে কোন ভাবেই রাজী হয় না। শেষে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। পড়ে অবশ্য শুনেছিলাম তার সাথে আমার পুতুল বিয়ে দিয়ে আমাদের সম্পর্ক বেয়াই-বেয়াইন হবে এই জন্য রাজী হয় নি।

দুজন একসাথে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। সব জুটি যে স্বপ্ন দেখে আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। আমরাও ঘর বাঁধার স্বপ্নদেখি। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়। তার খুব পুতুলের শখ ছিলো। আমি জানতাম অবশ্য সেই সখটি । একদিন কথা প্রসঙ্গে কি নিয়ে যেন পুতুলের প্রসঙ্গ উঠলো এবং যথারীতি আবদার, তার আসছে জন্মদিনে তাকে পুতুল দিতে হবে। আমি একটু ঘুরিয়ে বললাম বিয়ে হোক তাহলে তোমাকে একটি জলজ্যন্ত পুতুল দেওয়া হবে। চেয়ে দেখলাম তার চেহারা লজ্জায় রক্তবর্ণ হয়ে গেল, আর কিছু বলল না।আমিও ভুলে গেলাম।

দিনের রুটিন আজও একই আছে। তার সঙ্গ ছাড়া নিজেকে অপূর্ণ মনে হয়। ভালবাসার মানুষ পাশে না থাকলে মনে হয় এমনই মনে হয়। আমাদের লাইব্রেরী একটি অংশ ছিলো অনেকটা গুদাম ঘরের মতো যে জায়গায় ইস্যু করার বইগুলি থাকতো।

ঐ জায়গাটি ছিল আমাদের খুব প্রিয় চারিদিকে রাশি রাশি বই, পুরানো গন্ধ মাখা । নির্জন এই জায়গাটা আমরা খুব পছন্দ করতাম। চাইলেই তার স্পর্শ পাওয়া যেত, বইগুলি দেখতে দেখতে নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলা হত। সেই অনুভুতি গুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে। সচরাচর কাউকে লাইব্রেরীর লোকজন যেতে দিতো না। আমরা কেমন করে জানি অহরহই ঐখানে যেতে পারতাম। আর একটা জায়গা ছিল লাইব্রেরীর অডিও ভিজ্যুয়েল রুম। ঐ খানে কাজ করতো আমার সম্পর্কের মামা। সব ধরনের অডিও ভিজ্যুয়েল সরঞ্জামাদি ছিল। আমার আর তার হিন্দি ছবি দেখার জন্য এক সুন্দর জায়গা ছিল ঐটা । আমরা বাইরের ভিডিও লাইব্রেরী থেকে হিন্দি ক্যাসেট এনে ঐ জায়গায় দেখতাম। অবশ্য খুব একটা বেশী দেখা হয় নাই। দুজনের টুক টুক আলাপ করাই আমাদের বেশী ভাল লাগতো।

আমাদের টিএসসিটা তখন ও কমপ্লিট হয়নি। টিএসসি এর পিছনে বসে বসে বিকালে চা খাওয়াটা ছিল প্রতিদিনকার কাজ।

ধীরে ধীরে সবাই এখন আমাদের জুটি হিসেবেই চিনে। সবার তীর্যক দৃষ্টি এখন কিছুটা নমনীয়। সবার চোখে দেখতে পাই কিছুটা প্রশ্রয়। আর সেই সুবাদে আমরাও হই ভালবাসায় পরিপূর্ণ এক সার্থক জুটি। দিন যায়...

দুজনে মধ্যে ভালবাসার কমতি নেই। সমঝোতা তা ১০০% । একজন আরেকজনকে বুঝতে পারি । তার চোখের দিকে তাকালেই তার মনের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাই ।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৫ ই জানুয়ারি, ২০০৯ দুপুর ১:৪২

একদিন বিকেল বেলায় তার হলে তাকে ডাকতে গিয়ে দেখি সে হলে নেই । বান্ধবীদের জিজ্ঞাসায় জানতে পারি তার বোন এসেছিল এবং তাকে সহ তারা মধুপুর গেছে। আমাকে না জানিয়ে সে চলে গেল এই ভেবে বড় কষ্ট পাই । তখন তো আর মোবাইল এর যুগ ছিল না যে যখন তখন খবর জানতে পারবো। হতাশ হই । হলে ফিরে যাই।

-কৃষক

এই পর্বে কিষাণীর বক্তব্য:

পুতুল বিয়ের কথাটা ভুলে গেছিলাম এখন মনে পড়লো।

একটি পুতুল পছন্দ করে রেখেছিলাম, তাকে দেখিয়ে বলেছিলাম সেটা আমার চাই, পুতুলটির অনেক দাম ছিল। ও আমাকে পুতুলটা কিনে দেয়নি, সেটার কষ্ট কিন্তু আজো আমার রয়ে গেছে।

লাইব্রেরীর লেন্ডিং সেকশনে ঢুকার সময় ও খুব সিরিয়ার মুখ করে বই খুঁজতে ঢুকতো, একটু পর যেতাম আমি। কিসের বই খোঁজা, আমাদের অন্য ধান্দা ছিল।

মধুপুর চলে যাওয়াতে সে যে কষ্ট পেয়েছিল এটা আমাকে আগে বলে নাই। এখন জানলাম। তবে মধুপুর এর ভ্রমনটা অনেক দারুন হয়েছিল, ওখানে বনে আমরা দু'দিন ছিলাম, রাতটি ছিল ভরা পূর্ণিমা এবং প্রতিটি পর্যায়ে তাকে আমি মিস করেছিলাম।

- কিষাণী

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৭ ই জানুয়ারি, ২০০৯ বিকাল ৩:০৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৩

কিছু ছবি - কিছু স্মৃতি

গত নভেম্বর মাসে প্রিয় ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম, কিছু ছবি তুলে এনেছিলাম। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই ক্যাম্পাস। আজ কৃষক ছবি গুলো ব্লগে দিয়ে দিল।..... কিষাণী

এখানে আমরা ক্লাশ করতাম, দোতালার কোনার রুমটা ছিল ক্লাশরুম।

ফ্যাকাল্টি থেকে লাইব্রেরী তে যাবার পথ, ঐ দেখা যায় লাইব্রেরী

এই নদীর পাশে এমনি কোন বসার জায়গাতে আমরা বসতাম।

এসব নৌকা দিয়ে আমরা ভেসে বেড়াতাম, তবে নৌকাগুলো তখন এত সুন্দর ছিল না।

নদীর পাড়ে বসে জোৎস্না দেখছিলাম এক সন্ধ্যায়।
(বিশ্ববিদ্যালয় প্রেম-১৭ তে বলেছিলাম একথা।)

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৭ ই জানুয়ারি, ২০০৯ বিকাল ৩:০৫

এগ্রোনোমী প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে যাবার পথে দুপাশে আম গাছের সারি।

লাইব্রেরীর সামনের এই মাঠে এক রাতে বসেছিলাম, যেটা এক পর্বে লিখেছিলাম। এছাড়া প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতাম কৃষক আর আমি। (১৮ পর্বে বলেছি একথা।)

এই পথ ধরে লাইব্রেরী থেকে হলে ফিরতাম।

ফ্যাকাল্টি থেকে লাইব্রেরী তে যাবার করিডোর, এই পথে এত স্মৃতি।

লাইব্রেরী, যেখানে কেটেছে অধিকাংশ সময়।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

১৭ ই জানুয়ারি, ২০০৯ বিকাল ৩:০৫

লাইব্রেরীর আরেকটি ছবি।

ঐটা কিষাণীর হল।

এই মাঠে আমরা ধান বুনেছিলাম।

এটা এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি এবং এডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং।

প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড থেকে আরো পেছনে, মাঝে মাঝে বিকেলে বড়ানো হোত।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২১ শে জানুয়ারি, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৪

কৃষাণীর স্মৃতি থেকে-১১

সেকেন্ড ইয়ারে উঠে আমাদের দু'জনের জীবন যাপনের রুটিনের তেমন কোন পরিবর্তন হল না। সেই একই রুটিন। ভাল লাগার পাখায় ভর করে কিভাবে যে এক একটি দিন পেড়িয়ে যাচ্ছিল ।

নতুন ক্লাশে আমাদের সব সাবজেক্ট গুলো বেশ মজার ছিল।কৃষিকাজ খুব কঠিন ব্যাপার। সেকেন্ড ইয়ারে আমরা সেটা হাত থেকে নিস্তার পেলাম। এবং হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। অন্য ফ্যাকাল্টি থেকে আলাদা ছিল আমাদের সবকিছুই। বেশ ভারী ভারী নামের সব সাবজেক্ট, তাই আমাদের ভাবই আলাদা।

এক একজন টিচার ছিলেন এক এক রকম। ফ্লুইড মেকানিক্স এমনি কঠিন সাবজেক্ট, সেটা যে স্যার পড়াতেন তিনি এমনিতে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন তবে পড়াতে পারতেন না। পড়ানোর সময় সব গুলিয়ে ফেলতেন। তার মধ্যে কৃষক উনাকে আরো ক্ষেপিয়ে দিত। স্যার হয়তো একটা টপিক পড়াতে যেয়ে মোটামুটি গুবলেট বানিয়ে ফেলেছেন, এর মধ্যে কৃষক বলতো "স্যার এটা কি এমন হবে? আমার তো মনে হয় এমন হবে।" স্যারের তো মাথা আরো গুবলেট। ধরা খেয়ে রেগে লাল হয়ে যেতেন আর যা বোঝাচ্ছিলেন তা ও ভুলে যেতেন। পরে অনেক কষ্টে ভুজুং ভাজুং দিয়ে ক্লাশ শেষ করতেন।

পুরো ক্লাশের সময়টা চলতো দুই ছাত্র শিক্ষকের কথা চালাচালি। ওকে যতই বলতাম স্যারের সাথে এত ঝামেলা করার দরকার নাই। কৃষক তারপরও মজা পায়, বলে ব্যাটা পড়াতে পারে না, ভুল পড়ায় ক্যান, দেখো না এরপর আরো কি করি।

স্যার এরপর থেকে ওকে দেখতে পারতেন না। এর মধ্যে একদিন বিকেলে রিকশা করে ফেরার পথে 'পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে' র মত ঐ স্যারের সামনে পড়লাম। আমি তো মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, নির্ঘাৎ সেশনালে ধরা খাওয়াবে। কারন স্যার আবার ছিলেন একটু হুজুর টাইপ, কথায় কথায় রেগে যেতেন। দুজনকে দেখার পর মনে মনে উনার সব রাগ গিয়ে পড়লো কৃষকের উপর। আমাকে কিছু বলতে পারেন না, আমি ভিজা বিড়ালের মত চুপচাপ থাকি। মাঝে মাঝেই তিনি সে রাগের প্রকাশ ঘটাতেন। অজানা কোন কারনে আমার প্রতি উনার সহানুভূতি ছিল, আর ওর প্রতি ছিল ক্ষোভ। অনেকে হয়তো বলবে মেয়ে বলে আমাকে কিছু বলতেন না।

অনেক পরে আমাদের সেই শিক্ষক এর সাথে আমার একটা সহজ স্বভাবিক সম্পর্ক হয়েছিল। কিছুদিন আগে আমার কর্মক্ষেত্রে একটা কাজে এসে খুব আপন আপন ভাব নিয়ে গল্প করলেন, অনেক ভালো ভালো উপদেশ দিলেন, কাজের প্রশংসা করলেন। যদিও আমি সারাজীবন বলি অমুক স্যার সারাটা জীবন জ্বালিয়েছেন। প্রত্যেকেটা বছর তার একটা সাবজেক্ট থাকতো, এবং অবধারিত ভাবে সেটাতে আমরা গণহারে নম্বর কম পেতাম। নম্বর দিতে তিনি ভয়াবহ রকম কৃপন ছিলেন এবং আজো আছেন। সেই স্যার জ্বালিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে আর কৃষক জ্বালিয়েছিল উনাকে।

সেকেন্ড ইয়ারে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ছিল। আমার মাথায় সহজে সেটা ঢুকতো না। আর কৃষক যেন "এতদিন কোথায় ছিলে" ...এমন একটা ভাব নিয়ে কম্পিউটার ক্লাশকে ভালোবেসে ফেললো। এমন অবস্থা হল স্যার যেন ওকে পড়াতেই ক্লাশে আসতেন আর কৃষকও যেন সবই বুঝতো। কম্পিউটার রিলেটেড যত বই আছে তার কেনা হয়ে গেল, পড়া হয়ে গেল।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২১ শে জানুয়ারি, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৩

তখন আমরা ওয়ার্ড ষ্টার দিয়ে শুরু করেছিলাম মনে আছে। প্রোগ্রামিং সে ভালো বুঝতো, আমরা অন্যরা প্রায় সবাই গাধার মত কোন রকম বুঝতাম আবার ভুলেও যেতাম। ক্রমেই সে সেই স্যারের প্রিয় হয়ে গেল, কম্পিউটার ল্যাবে যখন তখন যাওয়ার অনুমতিও তার হয়ে গেল, যেটা আমরা পেতাম না।

এমন হল সে প্রায় সারাদিন কম্পু ল্যাবে পড়ে থাকে। এখন আর আমার পেছন ঘুরঘুর করে না। বরং তাকে খুঁজতে আমি ল্যাবে হানা দিতাম। হয়তো যেয়ে বলতাম "চল অন্য পড়াগুলো শেষ করি। একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না।" এদিকে ল্যাবে স্যারও থাকতেন তাই স্যারের সামনে বেশী কিছু বলতেও পারতাম না। আর সে প্রবল উচ্ছাসে আমাকে প্রোগ্রামিং বোঝানো শুরু করতো। আমি কখনো শুনতাম, কখনো রেগেমেগে হলে চলে আসতাম, কখনো সে আমার সাথে পড়তে রওয়ানা হত। এক সময় আমাদের বন্ধুরা কম্পিউটারকে আমার সতীন উপাধি দিয়ে ফেললো। আমার খুব কাঠখড় পোড়াতে হোত ওকে অন্য সাবজেক্ট পড়তে বসাতে। সে হিসেবে আমার নিজেরও কম্পিউটারকে সতীন মনে না হলেও শত্রু মনে হত। আমাদের দুজনের একসাথে পড়ে অভ্যাস, ওকে ছাড়া আমি পড়তেও পারি না, শিখতে বুঝতে সময় লাগে। আবার যদি নিজে পড়ে ফেলি তাহলে সে ঝগড়া লাগিয়ে দিত, আমি কেন একা একা পড়লাম। শুরু হল আমার উভয় সন্কট অবস্থা। ক্রমে ক্রমে এটা বাড়লো।

তার সব ভালোবাসার রূপ পরিবর্তন হয়েছে, তবে কম্পিউটারের প্রতি ভালোবাসার কোন কমতি এখনো হয়নি। যার একটা ফল : আজ আমি ব্লগে এসব লিখছি।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২১ শে জানুয়ারি, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৫

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-১২

আমাদের সম্পর্কটা আমার বাসায় কিভাবে জানলো সেটা বলি......

আমার পরিবারে আমাদের সব ভাইবোনদের বন্ধুদের অবাধ যাতায়াত ছিল। ছোটবেলাতেই দেখেছি আমার ভাইবোনদের সব বন্ধুরা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বাসায় আসতো গল্প করতো। তাই সে সুবাদে আমার সব বন্ধুবান্ধবীদের মত কৃষকও আমাদের ঢাকার বাসায় নির্বিঘ্নে আসতো। ছুটিতে যখন আমরা বাড়ী আসতাম, ঈদের ছুটি না হলে ও ঢাকায় আসার চেষ্টা করতো, ওর খালার বাসায় থাকতো এবং ঢাকাতেও আমাদের দেখা হত।

কখনো অন্য বন্ধুদের সাথে ও বাসায় এলে গল্প হোত, কখনো বা কৃষক ফোন করে সময় আর জায়গা ঠিক করতো, আমি বাইরে ওর সাথে ঘুরতে যেতাম। ফোনে কথাগুলো সরাসরি বলতে পারতাম না। তখন তো আর মোবাইল ছিল না। বাসার ল্যান্ড ফোনটাই ভরসা। আবার ল্যান্ডফোন ছিল এমন যায়গায় যেখানে কথা বললে সবাই কমবেশী শুনতে পেত। ওপাশ থেকে ও বলতো বের হতে পারবা?
আমি না কিংবা হ্যা বলতাম।
উত্তর হ্যা হলে পরের প্রশ্ন কখন বের হবা?
আমি চুপ।
তখন ও হয়তো বলল "নটায়"?
আমি বলি "না"।
পরের প্রশ্ন, দশটায়?
আমি বললাম 'হুম'।
একই ভাবে কোথায় দেখা হবে সেটাও হু, না, ঠিক আছে, এ জাতীয় কথায় সারতাম। বাসা থেকে বের হওয়া নিয়ে তেমন ঝামেলা হোত না, এতদিন পর বাসায় এসেছি আদরের শেষ নাই, তাই সাত খুন মাফ।

আমার অন্য সব বন্ধুদের মধ্য থেকে ওকে আলাদা করে বের করা বা আমাদের সম্পর্কটা বাসায় কেউ আঁচ করবে এটা আমার ধারনার ও বাইরে ছিল। তবে আমার মায়ের সব কিছুতে ই তীক্ষ দৃষ্টি, মা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেলেন। আমার মা যখন কোন জরুরী কথা বলেন বা কোন তথ্য জানতে চান, তখন খুব খাতির করে কথা বলেন। কাছে এসে বসেন, এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আসল কথাটা বের করেন। তেমনি একদিন আমার রুমে আমি পত্রিকা বা কিছু নিয়ে অলস সময় কাটাচ্ছি, (বাসায় থাকলে তো আর পড়াশোনা করতাম না, হলে কত পড়ি আবার বাসায় কিসের পড়া....এমন একটা ভাব) মা কাছে এসে বসলেন।

এ কথা সে কথার পর সরাসরি প্রশ্ন আমি কাউকে পছন্দ করি কিনা। আমার তো মাথা চক্কর দিচ্ছে। আমি অনেক জোরের সাথে বলি "না"। ভাবখানা এমন এইসব করা কি আমার কাজ নাকি (মাকে কখনো মিথ্যে বলিনা এটা বলেই কেমন কেমন লাগছিল)। এদিকে মনে মনে ভাবছি এটা জিজ্ঞেস করলো কেন? এরই মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন..."অমুক"....ছেলেটা বাসায় আসে তোমার সাথে পড়ে, ওকে কি তোমার ভালোলাগে? ভাবলাম ধুর, ধরা যখন পড়েই গেছি, যা থাকে কপালে, বললাম হ্যাঁ ভাল লাগে। তারপর মা ওর সম্পর্কে ওর বাবা মা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি যেটুকু জানি বললাম। আর ওর সম্পর্কে বেশ ফুলিয়ে ফাপিয়ে বললাম, অনেক ভাল হেন তেন। আমার মা আমার আগ্রহটা দেখলেন এবং অনেকটা নিরব সম্মতি দিলেন বলা চলে। আমি তো মনে মনে মহা খুশি।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২১ শে জানুয়ারি, ২০০৯ সন্ধ্যা ৬:৪৩

ক্যাম্পাসে এসেই ওকে সব বলে দিলাম। মা আমার বড় বোনকে ঘটনাটা জানালেন, বললেন ছেলেটা কে একটু দেখো, কেমন লাগে। ওকে বললাম একদিন বড়আপুর বাসায় তোমাকে নিয়ে যাব।ও তো শুনেই পারলে তিন লাফ দেয়, "ওরে বাবা আমি যেতে পারবো না, ওখানে যেয়ে কি বলতে কি বলবো"। বুঝলাম সোজা বুদ্ধিতে কাজ হবে না। অন্য পথ ধরতে হবে।

এরপর যখন আবার ঢাকা যাওয়া হল। দুজন বের হয়েছি বিকেল বেলা। রিকশা নিয়ে ঘুরছি।ও বলছে "কোথায় যাবো"। আমি বলছি "চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই, সারপ্রাইজ, আগে বলা যাবে না"। এমনি করে ফার্মগেট থেকে ক্রমাগত প্রশ্ন কোথায় যাচ্ছি, আমি ও এটা ওটা বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। তারপর মহাখালি এসে যখন গলির দিকে যেতে বললাম তখন ও বলল, "এই, এদিকে বড়আপুর বাসা না"? ক্যাম্পাস থেকে অনেকদিন ও আমাকে এ বাসার কাছাকাছি নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই কাছাকাছি হবার পর বুঝতে পারলো কোথায় এসেছে। আমি বলছি, "একদম ঝামেলা করবে না, ভাল মানুষের মত যাবে, কথা বলবে তারপর চলে আসবে"। ও তো পারলে রিকশা থেকে নেমে পালায়, এমন একটা ভাব ধরলো, আমি শক্ত করে ওর হাত ধরে থাকলাম।

তারপর বড়আপুর বাসায় আগে থেকে কিছু বলে যাইনি। বন্ধুকে নিয়ে এসেছি বললাম। ওকে বসার ঘরে বসিয়ে আপুকে নিয়ে আসলাম।আপু ওর সাথে গল্প করলেন, বাড়ীর সবার খবর, ঢাকায় ওর যে খালা থাকেন তাদের খবরাখবর নিলেন। উনি তো এক্কেবারে শান্ত শিষ্ট হয়ে, দুই হাত কাচুমাচু করে বসে আছেন। যেন কত্ত লক্ষী ছেলে। যা প্রশ্ন করছে, ভালমানুষের মত জবাব দিচ্ছেন। ওর ভালো মানুষি দেখে আমারই হাসি পাচ্ছিল, মনে মনে আমার ভয়ও লাগছিল। একটু পর দুলাভাইও এলেন, কথাবার্তা, চা খাওয়ার পর কৃষক বিদায় নিল; আমি আপুর বাসায় থেকে গেলাম।

কৃষক পরে এটাকে বলেছিল ওকে নাকি ইন্টারভিউ নিয়েছিল আমার আপু। আর ইন্টারভিউতে কৃষক পাশ ও করেছিল। আমার পরিবারে এটুকু স্বাধীনতা আমাদের সকলের ছিল। জোর করে আমাদের উপর কখনো কিছু চাপিয়ে দেয়া হত না।

কোন কিছুকে যদি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পাওয়া যায় তাহলে তাকে রক্ষা করতে হলে বা ধরে রাখতে হলে তার থেকেও অনেক বেশী সাবধান হতে হয়, আরো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।......

আমাদের সম্পর্কটা একটা স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছিল, ...যদিও আমি স্বীকার করতে অনেক গড়িমসি করেছিলাম, এটা আগে বলেছি। কিন্তু এই সম্পর্কটাকে সফলতার রূপ দিতে আমাদের দুজনের উপরই অনেক দায় ছিল।

..........এদিকে আমার মা এবং বোন বিষয়টি জেনে যাবার পর, তাদের মৌন সম্মতি দেবার পর দায়টা যেন আরো বেড়ে গেল, আমাকে প্রমান করতে হবে আমি ভুল করিনি। যে মানুষটিকে ভালওবেসে বেছে নিয়েছি সমাজ সংসারের বিবেচনায় সে সঠিক ব্যক্তি। তবে এটা প্রমান করাতো আমার একার কাজ নয়। কৃষক কে যে আমার সাথে থাকতে হবে............এ দায় অথবা দায়িত্ব যে তার ও।

যে তরীটি আমরা ভাসিয়েছি তাকে কূলে নিতে হলে দুজনের এক হয়ে চলতে হবে। ....

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৫ শে জানুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:৫১

বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রেম - ২৬

ষড়ঋতুর এই দেশে - ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যলয়ের ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পরিবর্তন আমাদের ভালবাসার মাঝেও এনে দিতো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। আগে ঋতু পরিবর্তন হতো তার নিজস্ব নিয়মে কিন্তু এখন তার পরিবর্তন আমি টের পাই নিজের মাঝে, নিজের সত্ত্বায়, আমার মাঝেও আন্দোলিত হয় ঋতু পরিবর্তনের হাওয়া।

গ্রীষ্ম
বৈশাখের প্রথম দিনের ভোরবেলা ব্রক্ষ্মপুত্রে পাড়ে ঘুরতে যাওয়া হয়ে উঠেছিল আমাদের বাৎসরিক রুটিন। মনে আছে খুব ভোরবেলা ১নং গেটের কাছাকাছি মেলা শুরু হতো। আমরা যথারীতি সেখানে গিয়ে হাজির। পান্তা ইলিশের কথা মনে না থাকলেও সেখানে ঘুরতে যাওয়ার স্মৃতি আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। কিছুক্ষন সেখানে থাকার পর বসতাম শান্ত নদীর পারে। এরপর ফিরে আসতাম টিএসসি তে বা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম। বিকেলে অবধারিত ভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো আর আমরা সেখানে হাজির। অবশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার চেয়ে হলের নির্ধারিত সময়ে বেশ কিছুক্ষন বাইরে থাকা যায় এটাই আমার কাছে বেশী পাওয়া বলে মনে হতো।

গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে হাতে যখন কোন কাজ থাকতো না তখন বোটানিক্যালের দীর্ঘ গাছের ছায়া আর নদীর শান্ত রূপ আমাদের মনে বুলিয়ে দিতো শান্তির পরশ। এর মাঝে বাড়তি পাওনা হিসাবে যোগ হতো এক পশলা হিমেল হাওয়া। নদীর পাড়ে বসে থাকতে থাকতে মনে হতো আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই।

তবে বৈশাখের আম, আর জৈষ্ঠ্যের কাঁঠাল আমার ভাগ্যে খুব একটা জুটেনি কারণ পুরো গ্রীষ্মে ছুটির বেশীর ভাগ সময় থেকে যেতাম ক্যাম্পাসে। বাসায় গেলেও ৪-৫ দিনের বেশী থাকা হতো না। গোলাপ, বকুল, বেলী, টগর, জবা এই গুলি চোখে পড়তো এই সময়। তাকে কোনদিন বকুল কিংবা বেলী ফুলের মালা দিয়েছিলাম কি ? মনে পড়ছে না তবে ফুল দিয়েছিলাম এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিষাণীর কথা

..... আমি যখন পোষ্ট দেই কৃষক তখন চুপচাপ পড়ে কোন মন্তব্য বা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। তবে সে যখন পোষ্ট দেয় আমি একদম নির্বিকার থাকতে পারিনা। তাই মাঝখানে এসে আমার কথাগুলো জুড়ে দেই।

বৈশাখের প্রথম দিনে আমি খুব সাজতাম, শাড়ী পড়তাম, খোঁপায় ফুল দিতাম এটা বলে নাই। আমার সাজগোজ কখনো চোখ মেলে দেখেছে কিনা আল্লাহ মালুম। গ্রীষ্মকালে কৃষ্ঞচূড়া ফুটতো, আর ছিল জারুল। নদীর ধার ঘেষে জারুল গাছ গুলো যে কি অদ্ভুদ সুন্দর ছিল, আর জব্বারের মোড় এবং ১ নং গেট এর রাস্তা বরাবর কৃষ্ঞচূড়া গাছ।

বেলি ফুল দিত আমাকে, আর বকুল ফুলের গন্ধ আমার একবিন্দু পছন্দ না। তাই ওটার মালা দিতে চাইলে ও আমি নিতাম না।

বর্ষা
বাঙ্গালী মন বর্ষায় আন্দোলিত হয় না এমন মানুষ পাওয়া দুস্কর। বর্ষা এলে ব্রক্ষ্মপুত্র তার কানায় কানায় পূর্ণ হতো । আমি চোখ মেলে তার পরিবর্তিত রূপ দেখতাম।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৫ শে জানুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:৫১

গাছের পাতা গুলি তাদের সমস্ত ময়লা ঝেড়ে ফেলে হয়ে উঠতো আরও সবুজ, আমি নয়ন ভরে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতাম। এক সময় ঈশা খা হলে টিনসেডে যখন ছিলাম বাড়তি পাওনা হিসেবে পেতাম বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ।

বৃষ্টির মধ্যে পর্দা টাঙ্গানো রিক্সায় ঘুরা ছিল আমাদের নিত্য দিনের কাজ। খুজে খুজে মোটা পর্দার রিক্সা ভাড়া করে শহরের দিকে যেতাম। পর্দাটা মুখ পর্যন্ত তুলে দিয়ে বসে থাকতাম। আর একটু বেশী করে কাছাকাছি থাকা।

গন্ধরাজ, জুই আর কদম ফুল চোখে পড়তো এই সময়। স্পষ্ট মনে আছে প্রতি বর্ষায় তার হাতে অন্তত একটি হলেও কদম ফুল তুলে দিয়েছি।

কিষাণীর কথা
বর্ষার এক অসাধারন রূপ ছিল আমাদের ক্যাম্পাসে। জায়গাটা এমন বৃষ্টি যখন শুরু হোত, আর থামার নাম থাকতো না। একটানা তিন দিন, সাত দিন বৃষ্টি। তারপরও কোথাও পানি জমতো না। সবুজ যেন আরো সবুজ হয়ে যেত। আমরা হেঁটে হেঁটে ক্লাশে যেতাম। তারপরও কোন অভিযেগ নেই। ঝুম বৃষ্টি হলেই রিকশায় ঘোরা। আমি ছাদে উঠে ভিজতাম, চারপাশে কোন উচু বিল্ডিং ছিল না, আহা কি যে মজা, বোঝানো যাবে না।

শরৎ
ব্রক্ষপুত্রের চরে ছিল প্রায় দিগন্ত বিস্তৃত কাশবন। শরতের মেঘলা আকাশের নীচে কাশবন সৌন্দর্য্য ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নদী পাড়ে বসে থেকে কাশবনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কতদিন অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছি ।

এই সময় দূর্গাপুজা হতো। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বিশাল আকারে দূর্গাপুজা হতো শহরে । আমরা যথারীত ঘুরবার নাম করে সেখানে হাজির।

শিউলী, মল্লিকা আর কামিনী ফুল চোখে পড়তো বোটানিক্যালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপনায় এবং বিশাল ল্যান্ডস্ক্যাপিং এ পৃথিবী বিখ্যাত লোকেরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে এমন একটি পরিবেশ আমাদের উপহার দিয়েছেন যেখানে প্রতিনিয়ত খেলা করে ভিন্ন রং, ভিন্ন আমেজ। আর আমরা ভিন্নতার স্বাদ পাই প্রতি নিয়ত।

শরৎ এর পড়ন্ত বিকেলে যখন সূর্যের তেজ কমে আসে বা আরশোলা রঙের গোধূলীতে তার হাতে হাত দিয়ে ভালবাসার পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়।

কিষাণীর কথা

তার সাথে প্রথম আমার কাশের বন দেখা হয়।

তবে ভাদ্রমাসে প্রচন্ড গরম পড়তো, অনেক বেশী আর্দ্রতা থাকার ফলে সারাক্ষন ঘাম হোত। ঠিক ভাদ্র মাসটার পরই ফাইনাল পরীক্ষা গুলো হোত। ফ্যানের নীচে বসে ঘামতাম আর পড়তাম এজন্য মনে আছে। আমি সারাক্ষন বলি, ওখানে গরম, শীত এবং বৃষ্টি তিনটাই বেশী। এমন অদ্ভুদ আবহাওয়া আমি আর কোথাও দেখিনি। দূর্গাপূজার চেয়ে কালীপূজায় আমরা মজা পেতাম বেশী।

হেমন্ত
এগ্রোনমী ফিল্ড তখন ভরে যেত সোনালী ধানে। মনে হতো এইখানের সবকিছুই সোনায় গড়া। এই সোনালী জগতের বুক চিরে কোন আঁকাবাকা পথ নয়, গিয়েছে

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৫ শে জানুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:৫১

কনক্রীটের ঢালাই রাস্তা। রাস্তার দুপাশে আমের সারি। একেবারে ছবি মতো সুন্দর করে গড়া। নবান্ন দেখা না হলেও এইখানে এই সময় টাতে বেশ ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যেতো। এই সময় কোন কোন দিন নির্জন প্রান্তরে নিজেদের লাগানো ধান গাছ দেখার ছলে সেখানে হাজির হতাম। নির্জন প্রান্তরে শুধু আমরা দুজন ঘুরে বেড়াতাম। ভোর বেলা ঘাষের ডগায় শিশির এর আভাস দেখা যেত। প্রতিদিন তার পায়ে দলিত হতো অগ্রহায়নের প্রথম শিশির।

শীত

তার শীতে ছিল খুব ভয়। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত সে আরও একটু বেশী মোটা হয়েছে। কারন অনুসন্ধানে নেমে দেখা গেল প্রতিদিন সে কয়েক ধাপে কয়েকটি জামা পড়েছে। অবশ্য চারিদিক গাছপালায় পরিপূর্ণ থাকায় ঠান্ডা একটু বেশী অনুভুত হতো। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। শীতকালে তার হলের সামনে ভাঁপা পিঠার আয়োজন করে এক খালা। আমরা ছিলাম তার প্রতিদিনের কাস্টমার। আর প্রতিদিনের খরিদ্দার হওয়ার কল্যানে আমাদের ভাগ্যে জুটতো স্পেশাল বানানো পিঠা। খালা কেমন আছে জানি না । যেখানেই থাকুক ভালো এবং সুস্থ থাকুক। বসন্তের আগে আগে পুরো বিশ্ববিদ্যলয়ের বাগান গুলো পরিচর্যা এবং নতুন করে গাছ লাগানো ব্যস্ততা শুরু হতো। বসন্তকে বরণ করে নেবার প্রস্তুতি। তবে এর মাঝে কয়েকটি বেড এ সূর্যমুখী এর গাঁদা ফুটে থাকতো । বোটানিক্যাল এর গাছগুলিকে একটু মলিন মনে হতো। নদীও তার নাব্যতা হারিয়ে শেষ তলানীতে গিয়ে পৌছাতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকতো প্রায় প্রতিদিন। আর আমরা সেই সুযোগ কখনোই হেলায় হারাতাম না।

কিষাণীর কথা

আমি মোটেই মোটা ছিলাম না। তবে ক্যাম্পাসের বৃষ্টির মত শীতও ছিল প্রচন্ড। গাড়ো পাহাড়ের হাওয়া আর পাশের নদী দুটোর সম্মিলিত প্রভাবে শীত পড়তো জাঁকিয়ে। তাছাড়া আসলেই আমি শীতে কাতর হই।এটা এখনো কৃষকের মনে আছে জেনে ভলো লাগছে।

বসন্ত

বছর ঘুরে অবশেষে আসতো বসন্ত। পত্রিকার পাতা যখন দেখতাম লেখা ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হতো এসে দেখে যান এইখানে কত ফুলের সমারোহ আজ। বসন্তের পরিপূর্ণতা আজ এখানেই প্রকাশ পেয়েছে জমকালো ভাবে। নতুন করে প্রকৃতি তার রূপ খুলে দিতো আর আমাদের ভালবাসার ডালপালা গুলিও ভরে যেত নতুন পত্রে। বসন্তে সময় টাতে আমাদের পরীক্ষাগুলি শেষ হয়ে যেত । লেখাপড়ার তেমন চাপ না থাকায় । বসন্তের রোদেলা সকাল, উদাস দুপুর আর পড়ন্ত বিকেল সব সময় তার কাছাকাছি থাকতাম।

সে পাশে থাকাতে সেই উত্তাল যৌবনের দিনগুলিতে প্রাণভরে আমি সেই ঋতু বৈচিত্র উপভোগ করেছি। আমার কাছে এই বৈচিত্রগুলি ধরা দিয়েছে প্রতিবার এক নবরূপে।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

৩১ শে জানুয়ারি, ২০০৯ দুপুর ১২:২২

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৭

কিষাণীর স্মৃতি থেকে- ১৩

কে প্রথম কাছে এসেছি
কে প্রথম চেয়ে দেখেছি
কিছুতেই পাইনা ভেবে
কে প্রথম ভালোবেসেছি........
তুমি...না ...আমি।।

আজ লিখতে বসে এ গানটা কেবল মাথায় ঘুরছিল। আমাদের অনেকটা এমনই অবস্থা ছিল, যদিও প্রকাশ কৃষক আগে করেছিল, আর আমি পরে অনেক ঘুর পথে এ পথে এসছিলাম। এটা আগেই বলেছি।

আমি ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ক্যারিয়ার পাগল মেয়ে। সেটা অর্জন করার জন্য আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল। আমি হয়তো কিছুটা নারীবাদীও, ...কিছুটা নয় হয়তো অনেকটাই। এই ক্যারিয়ার নিয়ে যে আসক্তি সেটা আমার জীবনের মোড় কে বারবার পরিবর্তন করে দিয়েছে। কৃষক এর বাবা মা দুজনই চাকরীজীবী ছিলেন, এ ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগতো। একদিন ওকে বললাম, মেয়েরা চাকরী করে এটা আমার খুব ভালো লাগে, তোমার মা চাকরী করেন এটা আমার ভালো লাগে। পড়াশোনা শেষ করে আমিও চাকরী করবো। দেখলাম সে এটা তে খুশি হল না। বুঝলাম মা চাকরী করাতে তার একটা চাপা ক্ষোভ আছে। অথচ তার মা তাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন, কখনো কোন ট্রেনিংএ গেলে ওর আবদারটা সবার আগে পূরণ করতেন; মায়ের এবং বাবার কাছে তার আবদারও ছিল সীমাহীন। বেশী চঞ্চল বাচ্চাদের প্রতি সব বাবা মায়েদের একটা আলাদা কেয়ার থাকে। সেটা কৃষকের ক্ষেত্রেও দেখেছি। বাবা মা দু'জনই তাকে অনেক ভালোবাসতেন, তবে ও সেটা স্বীকার করেনি কখনো, এখনো করে না। কৃষক আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে চাকরী করলে বাচ্চাদের কষ্ট হয়। অথচ আমার একটা আফসোস ছিল আমার মা গৃহিণী, আমার যে সব বন্ধুদের মায়েরা কর্মজীবী তাদের দেখে ঈর্ষা করতাম। ভাবতাম ইস আমার যদি এমন হোত! আমার পছন্দের মানুষটির সাথে আমার এমন মতের অমিল দেখে আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। আমার মুখে একেবারে আষাঢ়ের মেঘ। আমি মনে হয় ওকে বলেছিলাম "আমাদের কিছু ব্যাপার এখনই পরিস্কার করে নেয়া দরকার, আমি ক্যারিয়ার পাগল মেয়ে। শুধুমাত্র গৃহিণী হয়ে থাকা আমার দ্বারা হবে না। তুমি যদি অন্য কিছু চাও তাহলে এখনই ভেবে দেখ"..... এ জাতীয় কিছু সিরিয়াস কথা অনেক বেশী সিরিয়াস হয়ে বলছিলাম। বেচারা আসন্ন বিপদের ভয়ে তড়িঘড়ি ঐ প্রসঙ্গ শেষ করেছিল..... কেমন করে যেন প্রসঙ্গ পাল্টেছিল মনে নেই।

আমি সারাক্ষন কৃষকের সাথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়াও একসাথে পড়তাম, রুমে এসে আবার পড়াশোনা করতাম, যেটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যপার। কিন্তু কৃষক রুমে যেয়ে সে রকম পড়তো না। আবার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠতো। একথা আগেও বলেছি, আবারও বলছি কারণ এই বন্ধুদের জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল, হয়তো আমাকেও।..... সেটা অন্য একদিন বলবো।

আগে একটা পর্বে বলেছিলামআমাদের রোল নাম্বার পাশাপাশি থাকেনি সেকেন্ড ইয়ারে। ফলে ফাইনাল পরীক্ষার সময় পাশাপাশি বসা যাবে না। এখন কি উপায়? আমি বলি তাতে কি, পাশাপাশি বসার দরকার কি? কিন্তু না, তা হবে না। ফাইনাল পরীক্ষার সময় ফরম ফিল আপ করতে হোত, দুজনেরই টাকা জমা দেয়া হয়ে গেছে। ও বলল এখন ফরম জমা দিবা না। সবাই জমা দিয়ে নিক তারপর দিবা। কারন সবাই জমা দিয়ে ফেললে এডমিন থেকে রোল নম্বরের একটা সিরিয়াল দিবে। সবার রোল সেট হবার পর আমরা দুজন জমা দিব। তাহলে আমাদের একসাথে রোল পড়বে। মাথায় সারাক্ষন এইসব দুষ্ট বুদ্ধি, যদি এগুলা ভালো কোন কাজে লাগতো তাহলে কথা ছিল। আমরা ফরম ফিলআপ করছি না। অন্য বন্ধুরা বলে কি ব্যাপার, পরীক্ষা দিবা না নাকি? আমি বলি টাকা জমা দেয়ার রশিদটা হারিয়ে ফেলেছি, ওটা পেলেই দিব। গোপন পরামর্শের কথা কাউকে বলাও যাবে না। এটা ছিল নির্দেশ। আমাকে এমন জ্বালাতন করতো, তার কথা না শুনলেই তো আবার গাল ফুলাবে! তারপর যথারীতি সবার শেষে ফরম জমা দিলাম এবং দুজনের রোল হল পাশাপাশি। এতে যে মজাটা হল আগের বছরের ফেল্টু ভাইদের সাথে আমাদের সীট পড়লো, তাদের পরীক্ষা দেয়ার ষ্টাইলটা দেখলাম, সব ধুমসে নকল করতো। আর দেখে আমার ভয়ে হাত পা কাঁপাকাপি অবস্থা। আর সেশনাল ভাইভার সময় ওনারা কিছু পারে না, সব উত্তর আমরাই দিতাম, বিরাট মজা!

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১১:৪১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৮

কিষাণীর স্মৃতি থকে- ১৪

একসাথে রোল হয়ে আমাদের তেমন কোন সুবিধা হয়নি। আমাদের সময়ে প্রতি সাবজেক্ট এ পাশ নম্বর ছিল ৪০, তবে তাতেই হত না। এভারেজে ৪৫% না হলে পাশ হত না। তাই আলাদা করে প্রতি সাবজেক্টে শুধু পাশ করলে হবে না। ৪৫% তোলার জন্য কিছু সাবজেক্টে স্বভাবতই বেশী পেতে হবে। আগেই বলেছি কৃষক সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনায় কিছুটা অমনযোগী ছিল, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে মেতে থাকতো। যেখানে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে আরো ভালো রেজাল্ট করার কথা সেখানে কৃষক সব বিষয়ে পাশ করলো কিন্তু তার এভারেজে ৪৫% হল না। খবরটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। যে আশংকা নিয়ে আমি সারাক্ষন ওর সাথে রাগারাগি করতাম আমার সে আশংকা সত্যি হয়ে গেল। রেজাল্ট খারাপ করার জন্য শুধু কম্পিউটার দায়ী না সাথে আরো কিছু ছিল........আমি দুষতাম কম্পিউটার কে।

নতুন ইয়ারে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। দুটো বছর আমরা প্রায় সবকিছু একসাথে করেছি, এখন আলাদা হয়ে করা যে কতটা কঠিন সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। ওর বেশী কষ্ট হত, একে তো আমি পাশে নেই তার উপর জুনিয়রদের সাথে ক্লাশ করা। সব মিলিয়ে বেশ এক অস্থির অবস্থা। আমি তাকে কোন সান্ত্বনা দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই, তবে স্বাভাবিক ছিলাম, যতটুকু পারা যায়। আগের মত পাশেপাশে ছিলাম, ছায়ার মত।

আমাদের ক্যাম্পাসের এত রঙ তারপরও জীবনের সব রঙ যেন ধুসর হয়ে যেতে লাগলো। না শুধু তার রেজাল্ট খারপ করার জন্য নয়, রেজাল্ট খারপটা হল ফলাফল। চারদিকে রঙ গুলো ফিকে হয়ে গেল, কৃষকের ভুবনে অন্য কিছু রঙের আবির্ভবের জন্য, পরীক্ষায় খারপ করা, যার একটা পরিনতি ছিল।

সেকেন্ড ইয়ারে আমাকে যখন সময় কম দিত আমি ভাবতাম শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে মেতে আছে। আসলে ব্যপারটা তা নয়। কৃষক বরাবর চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে, কোন কিছু নিয়েই সিরিয়াস না। সব ব্যাপারে সীমাহীন কৌতুহল, একেবারে ভিতরে ঢুকে সব কিছুর রহস্য উদঘাটন করতে চায়, সেটা ভাল মন্দ যাই হোক না কেন। সে ছিল একটা পাগলা ঘোড়ার মত, মাঝে মাঝে মনে হত এইতো বেশ আমার বশ মেনে আছে; পরক্ষনেই আবার দেখতাম, না, সে তো তার আপন ভুবনে মত্ত। আমার সাধ্য কি তাকে বশ করে রাখি। এই পাগলা ঘোড়া, খেয়াল আর এডভেঞ্চারের বশে বন্ধুদের সাথে তাল মিলাতে যেয়ে নীলবিষ চেখে দেখলো। ভাবলো কি আর হবে। এই একবারই তারপর আর নয়। বন্ধুরা হয়তো যেত এক কদম, বড়াই করতে যেয়ে সে যেত তিন কদম। নীল বিষ তাকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলো, চোরাবালিতে কখন সে ডুবে যেতে থাকলো সে নিজেও বূঝতে পারলো না, আমিও না। সেজন্যই তার পড়ায় মন বসতো না, প্রেয়সীর সাথে সময় কাটানোতে ছন্দপতন হত। এটি বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। প্রথম প্রথম যখন যা কিছু করতো আমাকে বলতো, আমি যখন আপত্তি করা শুরু করলাম তারপর থেকে কিছু কিছু কথা আমাকে গোপন করা শুরু করলো। মিষ্টি করে মিথ্যা সাজিয়ে বলে দিত, আমি অবলীলায় তার সব কথা বিশ্বাস করতাম। ভালোবাসলে মানুষের যুক্তি বুদ্ধি কমে যায়, দুরদৃষ্টি কমে যেয়ে একরকম অন্ধ হয়ে যায় .... আমার একেবারেই সে রকম অবস্থা ছিল। আমার অবস্থা এমন ছিল কৃষক যদি ভয়াবহ কোন অপরাধ করে আসে, সারা দুনিয়ার মানুষ তাকে দুষছে। আর ও আমাকে এসে বলে, কিষাণী আমার চোখের দিকে তাকাও বল আমি এটা করতে পারি? আমি অবলীলায় বলতাম, সবাই ভুল বলছে কৃষক সত্যি বলছে।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১১:৪১

আমাদের দুজনের একটা সুন্দর সাবলীল জীবন ছিল। অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারে কোন ভাবনা ছিল না। দুজনের পরিবারই দুজন কে যথেষ্ট স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছলতা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠিয়েছিল। ক্যাম্পাসে আমরা নজরকাড়া, সকলের ভালবাসায় সিক্ত, ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর একটা জুটি। আমার পরিবার আমাদের সম্পর্কটি নীরবে মেনে নিয়েছিল,তার পরিবার থেকেও আপত্তি হবার কোন কারন ছিল না। কারন তার বাবা মা তাকে অনেক ভালোবাসতেন। সবকিছু যখন এত অনুকূলে তখন শুধুমাত্র খেয়ালের বশে এডভেঞ্চার করতে যেয়ে কৃষকের মত প্রাণবন্ত, ঝলমলে একটা তরুন নীলবিষকে কাছ থেকে দেখতে যেয়ে নিজেই তার বশে চলে গেল। কিষাণীর স্থান ছিল কৃষকের হৃদয় জুড়ে, আর নীলাভ কালসাপ দখল করলো ওর রক্ত, শরীরের কোষ এবং মস্তিস্কের নিউরোন।

চোখের সামনে একটা ঝলমলে ছেলে কেমন শুকনো পাতার মত মলিন হয়ে গেল। তার বেশভূষায় মলিনতা, আমি যদি জিজ্ঞেস করি কাপড় পরিস্কার নেই কেন, আজ সেভ করনি কেন, গোসল করনি কেন, সব প্রশ্নের একটা জবাব কোথা থেকে তৈরী থাকতো সেই জানে। অতি মাত্রার বিশ্বাস থেকে তার এই ধীরে ধীরে বদলে যাওয়া কেন যে আমি বুঝতে পারিনি!

এখনকার সময়ে প্রচার মাধ্যম গুলোতে মাদকাসক্তি অথবা এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যতটা প্রচারনা চালানো হচ্ছে তখনকার সময়ে, আজ থেকে ১৭/১৮ বছর আগে ব্যাপারটা এরকম ছিল না। এখন সমস্যাটা মহামারীর মত তাই প্রচারটাও ব্যপক, তখন সমস্যার ব্যাপ্তি ছিল অতি সামান্য, সেই অতি সামান্যের মধ্যেই আমরা পরে গেলাম। আর সকলের মত সচেতসতা আমারও কম ছিল। তাই আমি তাকে হাত ধরে বলতাম, কথা দাও আর ঐসব খাবে না। সে আমাকে বলতো , তোমাকে ছুঁয়ে বলছি কিষাণী আর খাব না। আমি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতাম। শুধু মুখের কথায় যে কাজ হবে না সেটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার ছিল না।

সারা ক্যাম্পাস জানতো সে ঠিক নেই, চোরাবালিতে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে, আমি যে কেন জানতাম না! একসময় আমাদের এক কমন বান্ধবী ওর সামনে আমাকে হাসতে হাসতেই বলে যে ও কি করে। ও যথারীতি অস্বীকার করে, তখন আমি বুঝতে পারি যে ও সত্যি বলছে না। সেই মনে হয় প্রথম, কৃষক কিছু বললো আর আমি বিশ্বাস করলাম না।

তবে ও আমাকে দেয়া কথা রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলো। কিন্তু শরীরের পরতে পরতে যে বাসা বেঁধেছে সে তার অধীকার ছাড়বে কেন? শুরু হল প্রতিক্রিয়া। ওর প্রচন্ড মাথাব্যাথা হত। একসময় মাথাব্যথা নিয়ে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাড়ী থেকে ওর বাবা মা বড় ভাই ছুটে এলেন। আমি হলে বসে খবর পেলাম, যেতে পারলাম না। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। পরদিন সকালে আমরা বান্ধবীরা ৪/৫ জন ওকে দেখতে গেলাম। বান্ধবীরা ইয়ার্কি করছিল কিষাণীর আজকে শ্বশুড় শাশুড়ীর সাথে দেখা হবে। একদিকে ও অসুস্থ আরেক দিকে উনাদের সাথে দেখা হওয়া দুটো মিলে একটা অদ্ভুৎ অবস্থা ছিল। হাসপাতালে যেয়ে দেখি রোগী বহাল তবিয়তে বেডে বসে আছেন, মুখে সেই পরিচিত হাসি। স্বভাবসুলভ দুষ্টমি চলছে। অষুধ খাবার সময় হল, ঠান্ডা পানি নেই, সে ফাক্স এ রাখা গরম পানি দিয়েই খেল, তাতে আবার ওর মা একটু রাগ করলেন। অসহায় এক বাবা মা কে সেদিন দেখলাম। অনেক বান্ধবীদের ভীড়ে আমাকে আলাদা করে চিনবার কথা না, তবু কিভাবে যেন তাঁরা চিনে ফেলেছিলেন।

পরদিন আবার গেলাম হাসপাতালে, ওর বাবা মা ভাই চলে গেছেন। বন্ধুরা পালা করে হাসপাতাল ডিউটি করছে। প্রচন্ড মাথাব্যথা করছিল। আবদার করলো মাথা টিপে দাও, আমি মাথার কাছে যেয়ে বসলাম, শিশুর মত আমার কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকলো, আমি মাথা টিপে দিলাম, হাত বুলিয়ে দিলাম....পরম মমতায়। জীবনে এর আগে কখনো আমার কোলে মাথা রাখেনি, অথচ সেদিন এতটুকু অস্বস্তি লাগেনি, মনে হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। আমি তখন কেঁদেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে মনে হচ্ছিল যদি এভাবে তাকে আগলে রাখতে পারতাম সব অনিষ্ট থেকে! শিশুর মত সরল একটা মানুষ ছিল কৃষক, এখনো তাই। সারাক্ষন আমার কাছে তার আবদার, বাড়ীর সবার কাছে যেমনটি করে আমার কাছেও তাই। সব আবদার পূরণ করার সাধ্য আমার আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখেনা।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ৮:০৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ২৯

কিষাণীর স্মৃতি থকে- ১৫

হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে হলে ফিরে এল। ভাল হয়ে যাবার আপ্রান চেষ্টা, এন্টিড্রাগস গুলোর প্রতিক্রিয়া কম ছিল না। ঘুমঘুম ভাব লেগে থাকতো। হয়তো ওর আরো কোন কষ্টও হতে পারে আমার জানা নেই। কিছুদিন ভালো চলল। শহরের ডাক্তারের কাছে ফলোআপের জন্য যেতাম, দুজন একসাথে। একসময় বলল অষুধগুলো খেতে কষ্ট হচ্ছে, তা ছাড়া এখন তো সে বেশ ভালো, অষুধের ডোজ কমিয়ে আনা যায় কিনা। আমাকে স্বাক্ষী করে ডাক্তারের কাছ থেকে অষুধের ডোজ কমিয়ে আনলো, আমি ভাবলাম অমানিষার অন্ধকার এই কাটলো বলে। তখনকার ডাক্তার কোন কাউন্সিলিং নেই শুধু অষুধ দিয়েছিল! কিন্তু সব হিসাব যদি এত সহজ হত তাহলে তো কথাই ছিল না। অষুধের ডোজ একদিকে কমলো আর একদিকে ওটা বাড়লো। আমাকে হলে পৌঁছে দিয়ে তার নিজের হলে যাবার কথা, ঘন্টাখানেক পর আমার হলের বারান্দা থেকে দেখি, ওমা তিনি সেইসব বন্ধুদের সাথে রিকশা করে শহর থেকে ফিরছেন; একেবারে পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে অবস্থা। তারপর একরাশ মিথ্যার ফুলঝুরি, ঝগড়া, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা..........।

দুঃসময় যখন আসে তখন একা আসে না। এটাই তখন শুধু মনে হত। এই কষ্টের সাথে দুজন দু ক্লাশে থাকাটা যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। আমরা তারপরও দুজনের যখন ক্লাশ থাকতো না তখন একসাথে পড়তাম, আলাদা আলাদা পড়া.......ওর তাতেও কষ্ট হত। বেশীর ভাগ সময় ও পড়তো আমি ওর সাথে বসে থাকতাম। আমি আমার পড়া পড়তে গেলে তার অভিমান হত, সারা মুখ আষাঢ়ের কালো মেঘে ছেয়ে থাকতো। একদিকে তার শারিরীক মানসিক টানাপোড়েন, আমি সব সময় তার মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করি যাতে কোনভাবে মনে কষ্ট না পায়। এতে আরো খারাপ হল, কৃষকের আবদার আরো একটু বাড়লো। এটা কে আবদার না বলি, হয়তো তার মনে কিষাণী কে হারাবার ভয় কাজ করছিল, তাই সে কিভাবে কিষাণীকে কাছে রাখা যায় সে পরিকল্পনা করতে ব্যাস্ত। কিষাণী যে তার কাছ থেকে একটা সুস্থ স্বভাবিক জীবন পেলেই বর্তে যায় এই সহজ হিসেবটা তার মাথায় এলো না। সে ঘুর পথে আরো পরিকল্পনা করে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুললো।

পরিকল্পনাটা ছিল এরকম: হাইপোথিসিস হল, যেহেতু সে এখন জুনিয়র তাই আমি তাকে সময় কম দিব এবং এক সময় তাকে ছেড়ে চলে যাব। কাজেই একশন হল.... আমাকেও তার মত ইয়ার লস দিতে হবে!!!!!!! কোন একসময়, যখন সুসময় ছিল এরকম কথা আমি ওকে বলেছিলাম, দেখো আমরা তো ক্লাশমেট, আবার জুনিয়র হয়ে যেওনা তাইলে কিন্তু আমি নাই! এ কথাকে ভিত্তি করে সে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করলো, অথবা হয়তো সত্যিই ভয় পেত। আমি বলেছিলাম, ঠিকমত পড়, যাতে এবার পাশ করতে পারো, নাহলে আবারো ফেল করবে। আর সুস্থ হও। আমাকে টেনে নামাচ্ছো কেন? কে শোনে কার কথা।কৃষক সারাদিন এই এক কথা জপতে লাগলো কানের কাছে।

ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমার পরিবার অনেক অনেক বেশী স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন।সেই স্বাধীনতা আমার উপর খানিকটা দায়িত্ববোধ ও চাপিয়ে দেয়। যাতে আমি যা খুশি তাই করতে পারিনা। নিজের ভালোমন্দ টুকু বুঝে চলতে পারি।আমার উপর তোমার যতখানি অধিকার আমার বাবা মায়ের তার থেকে কোন অংশে কম না। আমি কোন প্রানে সেধে তাদের কষ্ট দিতে যাব? আমাকে পড়াতে তো আমার বাবার কষ্টে অর্জিত টাকা খরচ হয়। এটা তুমি তোমার বাবা মার জন্য উপলব্ধি কর তো নাইই, উল্টা আমাকে একটা ভুল কাজ করতে বলছো। আর

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ৮:০৫

আমার রেজাল্ট ভালো, হঠাৎ করে আমি ফেল করি কিভাবে, এগুলা কি বল? চাইলেও তো ফেল করতে পারবো না! সে আমার মূল কথাগুলো কিছুই মন দিয়ে শুনলো না। বরং কিভাবে ইয়ার লস দেয়া যায় তার নানা পন্থা আবিস্কার করতে লাগলো। আমি বেশী কিছু বললে আমাকে ইমোশনাল ব্লাকমেইল তো আছেই। তাই আমি পড়লাম একদম শাখের করাতের মধ্যে। শাখের করাত যে কি সেটা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

ক্লাশ করতে পারতাম না, করলে মুখ ভারী। তাকে নাকি পড়াতে হেল্প করিনা। ক্লাশ লাটে উঠলো, বান্ধবীরা হায় হায় করতে লাগলো। এদিকে তার গোপন অভিসন্ধি কাউকে বলাই যাবে না। আমি জানি এটা অসম্ভব তারপরও তার মতন করেই চলতে লাগলাম, ক্লাশ করতাম না। তবু যদি সে একটু পড়ে। আমাদের ক্লাশ উপস্থিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার ছিল, না হলে সেশনাল এ নম্বর দিবে না। এরপর যখন পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা শুরু হল আমি পরীক্ষা দিচ্ছি, তার মাথা গরম। ঝগড়া, রাগারাগি। কিছু পরীক্ষা দিতে পারলাম, কিছু বাদ গেল। একটা পরীক্ষা সময় সূর্যগ্রহন ছিল, ব্যাস শুরু হল তার কথা, সূর্যগ্রহন এ বের হবা না, এই হবে, সেই হবে, মূল কথা পরীক্ষা দিবা না। সে পরীক্ষা দিতেই পারলাম না। বিরাট ঝামেলা, একূল রাখি না ওকূল রাখি। আমার অবস্থা ও সঙ্গীন হতে থাকলো, এ রকম চলতে থাকলে আসলেই ফেল করতে হবে।

এরই মধ্যে আমি আর একখানা মাতব্বরী করলাম। কৃষক আমাকে বোঝাতো যে সে প্রায় সুস্থ। অথচ ওর বাবা মা নাকি এটা বিশ্বাস করেন না। আমি তখনো তাকে বিশ্বাস করি, নিয়মিত অষুধ কিনতো, খেত, কাজেই নিশ্চয়ই ঠিক পথেই আছে। আমি ওর বাবাকে একখানা পত্র লিখলাম (কি বুঝে লিখেছিলাম আল্লাহ জানে!), যে কৃষক তো এখন ভালো .... ইত্যাদি। ওর বাবা অসম্ভব ভালো একজন মানুষ, উনি আমাকে অনেক আদর মাখা একটা উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল তুমি কিভাবে এত নিশ্চিত যে কৃষক সুস্থ? আমার তো আক্কেল গুড়ুম, তাইতো! আমি তো শুধু ওর কথায় বিশ্বাস করেছি। এরপর আমার চোখের ভালোবাসায় অন্ধ থাকা জনিত পর্দাটা চলে গেল। দিব্য দৃষ্টিতে দেখলাম আমি যা বলেছি তা ভুল। বড় একখানা ধরা খাইলাম। এই চিঠি লেখার কথাটা কৃষকও জানতো না, এইপর্ব লেখা শুরু হবার পর কিছুদিন আগে তাকে বললাম।

এদিকে তার অবস্থার কোন উন্নতি নাই। মলিনতা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। একজন মাদকাসক্ত মানুষের যা কিছু সমস্যা থাকে সবই প্রকট হয়ে দেখা দিল। বাড়ী থেকে টাকা পাঠানোর সাথে সাথে তা দিয়ে দেনা পরিশোধ। সারা মাস ক্যাম্পাসের যাকে পেত তার কাছেই টাকা ধার করা। শরীর ক্ষয়ে আসতে লাগলো, চোখের নীচে কালি, কথা বলতে গেলে মুখ শুকিয়ে আসতো। পোশাক আগের চেয়েও অবিন্যস্ত। মাঝে মাঝে জোর করে হল থেকে কাপড় আনিয়ে ধুয়ে দিতাম। হয়তো বলা হল সেভ কর নাই কেন, বলতো টাকা নাই। যদিও জানি এ টাকা দিয়ে আসলে কি হবে। নিপুন অভিনয়, অবিরত মিথ্যা বলা.... সবই চলতো। তখন ব্যাপারটা এভাবে দেখিনি, এখন যেটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তখন সেটাকে অন্যায় মনে হত। মনে হত মিথ্যা কেন বলে, যার তার কাছে টাকা কেন ধার করে? এখন বুঝি এ অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। তখন মনে হত এখন বুঝি আমাকে আর ভালোবাসে না, তাই নিয়ে নিত্য অভিমান, কষ্ট পাওয়া, এখন বুঝি ভালোবাসা না বাসার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একভাবে বলতে গেলে এটা একটা অসুস্ততা, তাজেই চিকিৎসা এবং নিবিড় পর্যবেন ছাড়া সুস্থতা সম্ভব না। হলে থেকে সেটা হচ্ছিল না। ফলে সমস্যা দিন দিন বাড়ছিল, কমছিল না।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১০:১১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ৩০

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-১৬
যখন ভাঙ্গলো, ভাঙ্গলো মিলন মেলা ভাঙ্গলো.....

তখন এমন মনে হত সারক্ষন চোখে চোখে রাখলে হয়তো কন্ট্রোল করা যাবে। তাই মাঝে মাঝে বিয়ে করে ফেলার ভূতও মাথায় চাপতো। দু'পরিবার যেখানে রাজী সেখানে পালিয়ে বিয়ে করার মত হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। তবে একটা মজার ব্যপার হত, হয়তো আমি বলছি কোন কথা নাই, চল বিয়ে করে ফেলি......ও সামলাতো, হ্যা ঠিক আছে করবো, আগামী মাসেই করবো। আবার কখনো ওর বাতিক উঠলো, চল বিয়ে করি.......... তখন আমি বলতাম আচ্ছা আচ্ছা কোন সমস্যা নাই করবো। বেশ চলতো আমাদের বিয়ে করে ফেলা খেলা। যে বলতো বিয়ে করি সে সিরিয়াসলিই বলতো, অন্যজনের তখন সেটা অতি হাস্যকর মনে হত। এবং সেজন্য পালিয়ে বিয়ে করাটাও আমাদের হল না।

না, পালিয়ে বিয়ে করা আমাদের হয়নি। ঘর বাঁধা হয়ে ওঠেনি কৃষক কিষানীর, পালিয়েও না, অন্য কোন ভাবেও না। কোন এক চাঁদনি রাতে তার সাথে সারারাত জেগে থাকাও হয়নি। যারা এতদিন ভাবতেন আমরা বেশ সুখে ঘর সংসার করছি তাদের হতাশ করবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে এ পর্বে কিষাণী হয়তো পাঠকের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে।

সে সময়কার কথা বলি............. কৃষক আমাকে প্রাণপণে আটকাবার চেষ্টা করতে লাগলো, পরীক্ষা দেয়া যাবে না, ওর মনে হত এটাই আমাকে কাছে রাখার উপায়। এদিকে আমি কিছুতেই মানতে পারতাম না আমার পড়াশোনায় ওর বাধা দেয়াটা। আবার জোর প্রতিবাদও করিনি। যেটা ছিল মস্ত ভুল। প্রকারান্তরে আমি তার কথায় সায়ই দিয়েছিলাম, নইলে ক্লাশ করতাম না কেন? ফলে ওর মধ্যে একরকম প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল, হোক না তা ভুল, হোক না তা অন্যায়। আমি প্রতিবাদ করিনি যাতে সে আবার ড্রাগস এ ফিরে না যায়। কিন্তু সে তো ফিরেও আসেনি, তাই এই মায়া করে বরং আমি ব্যপারটা বেশ গুবলেট করেছিলাম। কইতে ও পারিনা সইতে ও পারিনা এমন ছিল অবস্থা।এই না বলা, না সওয়া অবস্থাটা কখনো ভালো নয়। মনের উপর চাপ তৈরী হয়........ চাপ বেশী হলে একসময় তা বিস্ফোরিত হয়। এখন এই বয়সে এসে, ঘাটে ঘাটে ধাক্কা খেয়ে শিখেছি, নিজের সাধ্যে যেটা কুলাবে না, নিজের মন যাতে সায় দেবে না, সে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়াই যাবে না। শুরুতেই বিনয় এবং দৃঢ়তার সাথে না বলতে হবে। আমি যদি শুরুতেই কঠোর হতাম, এসব অন্যায় আবদার আমি শুনবো না তাতে হয়তো কৃষক সাবধান হত। হয়তো সেটাই ভাল হত। অথবা কি জানি হত কিনা!

ভালোবাসা একটা মায়াময় বন্ধন।এ বন্ধনটা ততক্ষন ভাললাগে যখন তা শেকল মনে না হয়, অথবা ফাঁস মনে নাহয়। বন্ধনের মধ্যেও একটা স্বাধীনতা থাকতে হয়। তুমি আমি দুজনে দুজনার, কিন্তু আমার সবই তোমার নয়। নিজের একটা জায়গা থাকে। প্রত্যেকের একান্ত আপন ভুবন।সেখানে কারো প্রবেশ নিষেধ, খুব প্রিয় কারোও না। আমার আপন ভুবন কেমন যেন সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো, আমি বিপন্ন বোধ করলাম। ভালোবাসার বন্ধন আমার কাছে বড্ড বেশী আটোসাঁটো মনে হতে লাগলো। আমার জীবনের সিদ্ধান্ত কেন আমি নিতে পারবো না।কেন তার মুখ চেয়ে আমাকে অন্যায় মেনে নিতে হবে। যুক্তি বুদ্ধিরা বেশ জোরেশোরেই উদয় হল, সে আমার জন্য কি করেছে যে আমি তার জন্য আমার জীবন বিপন্ন করবো। আমি তাকে টেনে তুলতে চাই, আর সে কিনা আমাকে তার সাথে ডুবতে বলে...........।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১০:১১

এমনি হাজারো যুক্তি আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি খুব স্বার্থপর হয়ে যাই। মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। সেজন্য কৃষক ভাবে, কিষাণীর পড়াশোনা হোক বা না হোক সে আমার সঙ্গে থাকবে........ যে কোন উপায়ে.... যে কোন পরিস্থিতিতে। আর কিষাণী ভাবে কৃষক আমাকে ভালোবাসে না, বাসলে আমার ভালো চাইতো। নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে আমি কৃষক কেও ছাড়তে পারি।...... কিষাণীর মনে নানা দর্শনেরও উদয় হয়। আমি নিজেকে বলি মানুষের জীবন হল নদীর মতন, সেখানে বাধা দিলে, সে তার মত অন্য পথ তৈরী করে নেবে। অথবা উপচে পড়ে চারদিক ভাসিয়ে দেবে। আমার এখন দিক পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। .... প্রত্যেকের ভাবনাই যার যার অবস্থান অনুযায়ী ঠিক। কারন আমরা প্রত্যেকেই স্বার্থপর, হয়তো কিষাণী একটু বেশী।

কিন্তু আমরা কেন নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু ভাবলাম। কেন অন্যজনের অবস্থানে নিজেকে দাঁড় করালাম না। কেন এতদিনের বন্ধু কে মন খুলে সব বলতে পারলাম না? কৃষক কেন কিষাণীকে এসে বলল না .... কিষাণী এই বিষ আমি ছাড়তে পারিনা জানো, যতই চাই পারি না। তুমি আমার বন্ধু হবে? করবে সাহায্য আমাকে এ বিষমুক্তির জন্য? যদি ছিটকে পড়ি দুরে, তবু আমার পাশে থাকবে বল? কৃষক বলেনি এ কথা কিষাণীকে, যে ছায়াসঙ্গী হয়ে তার পাশে ছিল। কিষাণী এটা বলেছিল........ কিচ্ছু লুকিও না আমার কাছে... আমার চেয়ে আপন বাবা মায়ের পরে এই পৃথিবীতে তোমার আর কেউ নেই। আবার রাগ করে এটাও বলেছিল .... যদি ঐ বিষ আর খাও তবে আর আমার কাছে এসোনা। কৃষক রাগের কথাটা শুনলো, ভালোবাসার অনুনয়টা শোনেনি।তাই মন খুলে কিছু বলা হয়নি তার, প্রিয় মানুষটিকে হারাবার ভয়ে সারাক্ষন মিথ্যে ভালো সাজার অভিনয় করে গেছে। কিষাণী একথাও কখনো বলেনি তুমি সুস্থ হও যেভাবে পারো, কি করতে হবে আমাকে বল..... যতদিন লাগে আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো। বলেনি একথা। কেন বলেনি তা নিয়ে এই বেলা আর সাফাই নাইবা গাইলাম।

বরং কিষাণী একসময় বড় বেশী কান্ত হয়ে গেল, ক্ষয়ে যাওয়া এ মানুষটাকে আর ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। বড় কঠিন কথা বলে দিল কৃষককে, আর নয়, তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে..... দোহাই লাগে আর না। বেচারা কৃষক, পায়ের নীচে এমনি তার মাটি নেই.... এর ই মধ্যে যদি কিষাণীও না থাকে তাহলে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে তার। কিন্তু কিষাণী নির্বিকার, এতটা কঠোর তখন কেমন করে হয়েছিলাম জানিনা। কৃষকের অনেক প্রতিজ্ঞা অনেক অনুরোধও তখন আমাকে টলাতে পারেনি। আমি নিজেকে সরিয়ে নিলাম। আজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম: প্রচন্ড জলোচ্ছাসের সময় বাবা তার প্রিয় সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেই সন্তান যখন বাবার গলা চেপে থাকে একসময় বাবা তার সন্তানের হাত ছাড়িয়ে নেয়। এটা অবশ্যই নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়া। সিনেমা তে নায়ক নায়িকারা সব অসাধ্য সাধন করে। আমরা বাস্তবের দুই কৃষক কিষাণী..... অসাধ্য সাধন করার সাধ্য আমাদের নেই।

ব্যাপারটা অবশ্যই এত সহজ ছিল না। ওর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, সাথে সাথে ও সারা ক্যাম্পাস, আমার হল কাঁপিয়ে দিল। পাগলের মত শুধু এক কথা, না তুমি যাবে না। কত শত প্রতিজ্ঞা..... কত কাকুতি মিনতি। অনবরত হলে ডাকাডাকি........ হলের দারোয়ান ভাইরা ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন, আমাকেও। তাই তাদের মুখে কোন কথা নেই শুধু কৃষক ভাই এলে ডেকে দিতেন। আমি ভেতর থেকে বলতাম, বলে দেন আপা নাই। দুজনের মাঝে পড়ে বেচারাদের অবস্থা কাহিল হয়েছিল। ফিরে যেয়ে ওকে কি বলতো জানিনা, আবার ডাকতে আসতো। যে মানুষটার প্রতি এত ভালোবাসা, তার এত ডাক কেমন করে না শুনে থেকেছিলাম সে আমি জানি আর জানেন অন্তর্যামী।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১০:১১

কৃষকের বাবা ছুটে এসেছিলেন, আমাকে বোঝালেন যেন ওকে ছেড়ে না যাই, পিতৃসম এই মানুষটিকেও আমি ফিরিয়ে দিলাম। উনার হয়তো মনে হয়েছিল এই মেয়েটি না থাকলে তার ছেলে যদি আর সুস্থ না হয়!

তারপরও, এত এত দিনের সাজানো খেলাঘর আমার ভেঙ্গে গেল। সব একতুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে তবু কিষাণী কত নির্বিকার। এতদিনে আমি বেশ শিখে গেছি অভিনয়। চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বলতে পারি, তোমার জন্য আমার মনে কোন জায়গা নেই। যা হয়েছে হয়েছে, এবার আমাকে একটু শান্তি দাও।

এরই মাঝে একদিন রাস্তায় ও আমার পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো তোমাকে আমি অভিশাপ দিলাম, তুমি অনেক বড় হবে কিন্তু তোমার চারপাশে কাউকে পাবে না। আমি কিছুই বলিনি। চলে এসেছিলাম।আমার কি বা বলার ছিল, আমি যে ওর সামনে সহজ হয়ে সব শুনতে পারলাম এটাই তো বড় কথা!

এর কিছুদিন পর কৃষককে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য, মাঝে মাঝে খবর পেতাম ঢাকায় কোন কিনিকে ভর্তি হয়েছে। তবে আশার কোন খবর শুনতাম না। বাবা মা তাদের আদরের সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। না হোক ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, আপাতত ছেলে বেচে থাকুক এটাই তাদের কাছে অনেক। তিলতিল করে বড় করে তোলা সন্তানের প্রতি প্রত্যাশাটা এমনি করে বাবা মা ই কমিয়ে আনতে পারেন। এখানেই বাবা মা আর প্রেমিকার মধ্যে পার্থক্য।

সেই যে কৃষক আমাকে অভিশাপ দিয়ে চলে গেল, তারপর আর ওর সাথে আমার চোখের দেখা হয়নি। আজ অবধি না। যখন আবার যোগাযোগ হল .... অনেক অনেক দিনের পর........ সেটা পরে বলবো..। তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেলে কেন? পড়াটা শেষ করলে না। আমার ওপর জেদ করেও তো পড়াটা শেষ করতে পারতা। এতএত বছর পর ও বলেছিল.... শেষ যেদিন তোমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার চোখে আমার জন্য কোন ভালবাসা দেখতে পাইনি কিষাণী, শুধু ঘৃনা ছিল, তাই আর তোমাকে খুঁজিনি। এতদিন পর এটাও বলল, সারা ক্যাম্পাসে যেদিকে তাকাই শুধু তোমার স্মৃতি কিষাণী, ওখানে একলা হয়ে আমি কেমন করে থাকি! তাই আমার আর থাকা হয়নি।

অথচ কৃষক বিহীন ক্যাম্পাসে একলা একলা আমি কিষাণী ঠিকই পার করলাম আরো তিনটা বছর।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১১:২০

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম - ৩১

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-১৭

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু
আমারে দেবোনা ভুলিতে
আমি বাতাস হইয়া জড়াইবো কেশ
বেণী যাবে যবে খুলিতে.....

কিষাণী মুখ ফিরিয়ে নিল, আর কৃষক সেই যে চলে গেল, আর কখনো ফিরে এলোনা!!!!!!
কৃষক বিহীন ক্যাম্পাসে আমি কিষাণী ঠিকই পার করলাম আরো তিনটা বছর, একা একা, দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বুকে নিয়ে। কেন নয়, অভিনয় তো ততদিনে ভালোই শিখেছিলাম। দিব্বি স্বভাবিক হয়ে জীবনযাপন করেছি।অবশ্য কেউ কখনো ভুল করেও আমার সামনে এ বিষয়টা তুলতো না। তবে আড়ালে তো এটা ছিল ক্যাম্পাসের হট কেক। শুধু একবার সার্ভেয়িং করার জন্য মধুপুরে আমাদের একটা ট্যুর হয়, সেখানে যখন সবাই হৈ চৈ করছি, আনন্দ করছি। এমন সময় আমাদের এক বন্ধু যে কৃষকের খুব কাছের ছিল, নেশার সঙ্গী ছিল........ আমাকে জেরা করেছিল....... একটা পাহাড়কে তুমি এক ধাক্কায় ভেঙ্গে ফেলতে পারো?..... নাকি পারা যায়? চারদিকে সবাই আছে সবার সামনে এ প্রশ্ন। আমি অনেক তর্ক করেছিলাম .... আমারটাই ঠিক, এটা প্রমাণ করানোর চেষ্টা করেছিলাম।

সে বছর পরীক্ষা দেয়া নিয়ে অনেক অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কি যে সংগ্রাম আর ধকল গেছে, সে শুধু আমি জানি............ একেবারে ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়াবার মত করে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমার কাছের বন্ধুরা ও হয়তো আমাকে কাঁদতে দেখেনি আর কখনো। তবে নির্ঘুম রাতগুলোতে আকাশের ঐ তারা গুলো জানে কত কত রাত আমি চোখের পানিতে ভেসেছি। উদাস দুপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কোকিলটা যখন ডেকে ডেকে অস্থির হয়ে যেত, তখন কি যে কষ্ট!!!!!! প্রতিটা সন্ধ্যা কি অসহনীয় ছিল আমার জন্য!! আমার আপন দুঃখ, আপন আনন্দ একান্তই আমার হয়ে ছিল। মনে মনে কত উন্মুখ হয়ে থাকতাম একটা ভালো কোন খবর যদি পাই। ভুলে থাকার অভিনয় করা যায়, ভুলে যাওয়া কি যায়? অনেকদিন পর আমাদের এক ঘনিষ্ট বান্ধবীর কি একটা ট্যুর ছিল, সেটা কৃষকের বাড়ী যেখানে, সেখানে হবে। আমি একবারও তাকে বলিনি কৃষকের খবর নিও। ও ফিরে এসে বলল, কৃষকের বাড়ী গিয়েছিলাম। বললাম কেমন আছে? ও বলল, দেখলাম কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কেমন মনে হল, সুস্থ? ও বলল তাইতো মনে হল, তবে পুরোটা হয়তো না। কৃষক সেই বান্ধবীকে একবারও আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি।

ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার পর ওটাই ছিল দুর থেকে পাওয়া কৃষক সম্পর্কে আমার শেষ তথ্য। কৃষক ক্যাম্পাসে আর কখনো আসেনি। অথচ আমি ঠিকই থাকতে পেরেছিলাম, থাকতে হয়েছিল। মেয়েরা মনে হয় অনেক কিছু পারে। যে মেয়েটা ভালবাসার মানুষটার সাথে সামান্য অভিমানে বুক ভাসিয়ে কাঁদে, সে মেয়েটাই আবার মা হবার মত, সন্তান লালন করবার মত কষ্ট অবলীলায় হাসিমুখে সহ্য করে। সেজন্য বুকের সব কথা কোন অতলে গোপন সিন্দুকে ভরে রেখে, আমি আবার চলেছি সেই ক্যাম্পাসে। কষ্ট যে হত সেটা বলার অপো রাখে না। তার অনুপস্থিতি, সব জায়গায় সেই দিনগুলোর স্মৃতি ছাড়াও বাস্তব কষ্ট হল একা একদম একা পড়াশোনা করা, যেটা ভুলেই গেছিলাম। মনে হত যেন জীবন যুদ্ধ করছি। যে ক্যাম্পাসের প্রতিটা জায়গায় আমাদের পদচারনা ছিল..... কত কত দিন সে

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সকাল ১১:২০

জায়গাগুলোতে যাওয়া হয় না। কত পূর্ণিমা আসে কত বসন্ত আসে আবার চলেও যায়.........খবর ও রাখা হয় না। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে চলতে তখন অভ্যস্থ হয়ে গেছি।

দিন পেরিয়ে যায়.... বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সাঙ্গ হয়। আমার কর্মজীবন এবং সংসারজীবন দুটোই প্রায় একই সাথে শুরু হয়। এর মাঝে কিষাণী একটি সন্তানের গর্বিত মা হয়ে গেছে।

অতীতের স্মৃতিচারন প্রায় শেষ। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মত হবে। ফেসবুকে কিষাণীর একটি প্রোফাইল আছে। সেখানে আকাশ নামে একজন এড রিকোয়েষ্ট দিয়ে জানালো সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। আমি এড করলাম। বললাম কোন ফ্যাকাল্টি তুমি? বলল অমুক ফ্যাকাল্টি। ভাল কথা ঐ ফ্যাকাল্টির আকাশ নামে আমি কাউকে চিনি না। তবে যেহেতু আমরা মোটামুটি আমাদের প্রেম ঘটিত কারনে বিখ্যাত ছিলাম তাই আমাকে অনেকেই চিনতে পারে ভেবে আর কিছু বললাম না। ঐ ফ্যাকাল্টির অন্য যারা আছে তাদের খোঁজ খবর দিলাম, কে কোথায় আছে। ঐ বন্ধুটি মাঝে মাঝে মেসেজ পাঠায়...অমুক কোথায় আছে জানতে চায়। একদিন আমাদের এক বান্ধবী আমরা ডাকতাম পিচ্চি অমুক ....তার কথা জিজ্ঞেস করলো, পিচ্চি অমুক কই আছে। আমি অবাক! পিচ্চি কে যে পিচ্চি বলে ডাকা হয় এটা খুব ঘনিষ্ঠ সার্কেল ছাড়া কেউ জানবার কথা না। আমি বললাম, তোমার ছবি দাও না কেন? আমার ই মেইলে ছবি দিও। কোন কথা বলে না। অন্য বন্ধুদের জিজ্ঞেস করি আকাশ নামে কাউকে চিনিস, ওরাও চেনেনা।

একদিন বলে তোমার তো বিয়ে হয়েছে অনেকদিন বাচ্চা এত ছোট কেন? আর তোমার হাসবেন্ড কোথায় আছে?
এ প্রসঙ্গে বলি, কিষাণীর যার সাথে গাটছড়া বাঁধা হল তিনি ছিলেন চুপচাপ, শান্ত, এবং অত্যন্ত রনশীল। তখন মনে হয়েছিল এই ভাল, বেশী উদার হতে যেয়ে আবার কৃষকের মত সীমা ছাড়িয়ে যাবে । ঘর সংসার কিছুদিন ভালোই কাটলো তবে মনের মিল হলেও মতের মিল হয়নি আমাদের। ...আগেই বলেছিলাম আমি ক্যারিয়ার পাগল মেয়ে.... ক্যারিয়ারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন স্বামী....... নানা টানা পোড়েনে সংসার টেকেনি কিষাণীর। দশ বছরের সংসারের গল্পটির সংক্ষিপ্ত রূপ এরকম, কালপুরুষ দাদার মতে এটা আরেকটা উপন্যাস... তাই এটা এখানেই শেষ। কিষাণী এখন সন্তানকে নিয়ে সুখে আছে, কেউ যেন তাকে আবার দুঃখী ভাববেন না!!!!

ফেসবুকের সেই বন্ধুকে বললাম.... আমার প্রোফাইলটা খেয়াল কর নাই, ওখানে লেখা আছে সিঙ্গেল। সে বলল .. সরি আমি খেয়াল করি নাই।

ফেসবুকে আমার সাথে কথা হবার পর কৃষক একটা পোষ্ট দিয়েছিল, কেউ কেউ সেটা পড়েছে। এটা থাকলে সবাই আমাদের শেষটা জেনে যেত, তাই পোষ্টটা কৃষককে ড্রাফট করে ফেলতে বলি। আজ আবার রিপোষ্ট করে দিব।

একদিন মেসেজ দেয়, ফেসবুকে তোমার ছবিগুলো দেখলাম, একজনকে চিনলাম...... উনি তোমার দুলাভাই। আজব তো আমার দুলাভাইকে আমার ঘনিষ্ট বন্ধুরা ছাড়া কেমনে চিনবে!!!! এটা তাকে বললাম। তুমি তো আমার অনেক কিছু চিনো, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না কেন। তুমি অবশ্যই তোমার ছবি দিবা। সে ছবি দেয় না। মাঝে মাঝে মেসেজ দেয়.... আমি কোন উত্তর দেই না। ছবি না দিলে কারো সাথে কোন কথা নাই, কে না কে!!!!! আমার মাথায় একবারও আসে নাই যে এটা কৃষক হতে পারে!!!!!

এর প্রায় মাসখানেক পর কৃষক আমাকে মেইল করে .... আমি কৃষক। আমি তো অবাক। এত এত বছর পর! আমি মেইল করলাম ..সত্যি তুমি? উত্তর এল হ্যাঁ আমি। তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ফেসবুকে আকাশ নামে আমাকে এড করেছিলা? বলল হ্যাঁ আমি। আমি বলি, অন্য নামে এড করেছো কেন? বলে কি জানি ভাবলাম আমার নাম দেখলে যদি এড না কর। কথা বলবো না কেন???? ও বলে, তখন এমনই মনে হয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি কথা বলতা!!! আমার সেল ফোন নম্বর চাইল, দিলাম মেইল করে, তারটাও দিল।

অথচ আমি ওর নাম দিয়ে ফেসবুকে অনেক সার্চ করেছি, পাইনি । পাবো কিভাবে তার প্রোফাইল সব ছদ্মনামে। এর পর থেকে কৃষক এই পর্বটা শুরু করে। যখন আমি জানতাম না এটা কৃষক, তখন সে আমাকে ব্লগের একটা লিংক দিয়েছিল আমি খুলেও দেখিনি। এরপর আবার শুরু হল কৃষকের সাথে নতুন করে যোগাযোগ।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ বিকাল ৫:৩০

বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রেম - ৩২ - কৃষকের স্বীকারোক্তি

এই সম্পর্ক ভাঙ্গার পিছনে আমি আমার সমস্ত দায় স্বীকার করে নিচ্ছি। এ রকম একটি দোষই সম্পর্ক ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট।

আমি কিষাণীর অভিযোগ গুলিকে অস্বীকার করতে পারবো না, কারণ এই ঘটনা গুলি ঘটেছে আজ থেকে ১৫-১৬ বছর আগে। এই অভিযোগ অনেকগুলিকে সে তার নিজের পক্ষে দাড় করিয়েছিল সে সময় বা বলা যায় নিজেকে ডিফেন্ড করেছে সেই সময়।
তার অনড় সিদ্ধান্তে আমার সমস্ত চেষ্টগুলি ফিরে এসেছিল বিফল হয়ে। আমি তার চরিত্রের এই দিকটা খুব ভালভাবে জানতাম যে, একবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সে আর কখনও পিছন ফিরে তাকায় না। বুঝতে পেরেছিলাম সে আর ফিরে আসবে না। এখনও মনে হয় তেমনই আছে (একরোখা)

আমার দিক থেকে সব চেষ্টাই করেছি সেই সময়। শুধু যা করিনি তা হলো ভালো হয়ে তার সামনে উপস্থিত হওয়া। আর সেটাই বা করবো কি ভাবে? আমার সেই জগত থেকে বেরিয়ে আসতে লেগে যায় ২ বছর। দুই বছর অনেক সময়। তাকে বুঝাতে পারিনি আমি ২-৩ বছর জীবনের তুলনায় বড় অল্প সময়।

সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাকে মাঝে মাঝে দেখতাম। সবসময় সাজগোজ করা অবস্থায়, বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত, যে কেউ দেখে বলবে আগের চেয়ে বেশী উচ্ছল, সুখী। আমার কেন জানি মনে হতো এ সবই অভিনয় অথবা বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো জোড় করে তার হাত ধরে বলি অনেক অভিমান হয়েছে আর না। এসো আবার আগের মতো হয়ে যাই, এই আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি তুমি একটু সাহায্য করো, কিন্তু বলতে পারিনি কারণ একবার তো সে আমার পাশে ছিলো তারপরও ছাড়তে পারি নি। বরাবরই আমি নেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছি। শেষ দিকে শুধু শরীরের টানেই নেশা করতাম।

আমার কিষাণী বিহীন ক্যাম্পাস বড় বেশী অসহ্য মনে হতে লাগলো। একদিন তাকে লাইব্রেরীতে যাওয়ার পথে পথ আগলে বলতে চেয়েছিলাম কথাগুলি। কিন্তু সেদিন তার চোখে আমি ঘৃনা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। আমি নিশ্চিত আমি ভুল দেখিনি। কিষাণীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন? বুঝতে পারি, আমার আর কোন জায়গা নেই তার হৃদয়ে।

বাবা মা আর চাইলেন না এখানে পড়াতে। আমি আর অমত করলাম না। ফিরে গেলাম, কয়েকদিন এভাবেই কাটলো তার পর ভর্তি করা হলাম কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। ডিটক্সিফিকেশন শেষে ফিরলাম বাড়ীতে। ততদিনে কিষানীর সামনে দাড়ানো মতো মানসিক শক্তি আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

তারা বললো আবার পড়ালেখা শুরু কর অন্য কোন প্রাইভেট ইউনিতে (ততদিনে বাংলাদেশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চালু হয়েছে) আমার আর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ রইলো না। একদিন বাসায় ঘোষনা দিলাম আমি আর এই দেশে থাকবো না। বিদেশে চলে যাবো। এরপর থেকে প্রবাসী। প্রবাসে নতুন পরিবেশে নতুন নিয়মে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেই। আস্তে আস্তে স্মৃতিগুলি ধুসর হয়ে যায়। এর মাঝে আর কোন খোঁজ নেওয়ার চেষ্ট করিনি। কি লাভ হতো এই ভেবে।

গত বছর কি করে যেন হঠাত করে ****** এর সাইটে ঢুকে পড়ি এবং পরিচিত কে কে আছে খুজতে খুজতে কিষানীর নাম পেয়ে যাই। তার পর ইয়াহুতে তার নাম দিয়ে সার্চ দেওয়া পর ফেইসবুকের লিংক পেয়ে যাই।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:০৮

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেম--- যবনিকা

কিষাণীর স্মৃতি থেকে-১৮

মেইল করবার পর ওকে মেসেন্জারে এড করলাম। কৃষক দেশের বাইরে থাকে, তাই একটা সময় দিয়ে বলল এই সময় অনলাইনে এসো কথা হবে। আমি বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছি ১৬ বছর পর কথা হবে, হোক না মেসেন্জারে। ঠিক সময় মত সব কিছু গুছিয়ে পিসি ছেড়ে বসলাম। কত যে কথা। সব আমিই বলি। শুধু প্রশ্ন করি আর সে উত্তর দেয়। বিয়ে করেছে কিনা জানতে চাই, বাচ্চাদের কথা জানতে চাই। বউ বাচ্চার ছবিও দেখা হয়। ভারী মিষ্টি একটা বউ তার (ইয়ে মানে আমার চেয়ে সুন্দরী না)। ভালোবেসে বিয়ে করেছে ওরা, আর বাচ্চটা একেবারে মায়ের কপি।

একটা পর্বে ব্লগার বরুণাকে বলেছিলাম কৃষকের চুল সব কাশফুলের মত সাদা। ওটাও মেসেন্জারে জেনেছি। কৃষকের বর্তমান সময়ের ছবিও আমি দেখিনি।ওর সব ভাই, কাজিনদের খবর নিলাম। পিচ্চি পিচ্চি কাজিনগুলো সব নাকি এখন বিয়ে করে সংসার করছে!!!! সে ও আমার ভাই বোন এমনকি বাড়ীর পিচ্চিগুলার নাম ধরে ধরে খবর নিল। আমি অবাক হয়ে বলি, সবার নাম তোমার মনে আছে!

ফেসবুকের প্রোফাইলে তার যে জন্ম তারিখ দেয়া আছে, সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার জন্মতো আগষ্ট না তাহলে আগষ্ট লিখেছ কেন? ওপাশ থেকে বলে...জাননা কেন?...আমি সত্যি জানিনা ...মানে ভুলে গেছি। মনে করবার চেষ্টা করছি কি ছিল সেইদিন...একটু আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম...ঐ দিন কি তোমার হাত ধরেছিলাম নাকি? বলে কেন তুমি জাননা?....বুঝলাম তাহলে এটাই ঠিক। মনে মনে ভাবছি সেরেছে...আমি ভুলে গেছি সে তো ঠিকই মনে রেখেছে!

ক্যাম্পাসের একথা সেকথা বলছিল, অনেকদিন আগের ঘটনা আমি অনেক কিছু ভুলে গেছি....অবাক হই। বলি তোমার মনে আছে? সে বলে আমার সব মনে আছে কিষাণী, সব! কেন জানো? কারন আমাকে তুমি ছেড়ে গেছ আমি তো তোমাকে ছাড়িনি, তাই আমি কিছু ভুলিনি। কেমন লাগে!!!!!! মন খারাপ করে থাকি কিছুক্ষন তারপর বলি কৃষক গত ১৩ বছরে আমার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, ওসব স্মৃতি তাই আমার মনে নেই। তারপর ব্লগের লিংকগুলো দিল বলল পরে পড়বা, যাতে বোঝা যায় সে কিছু ভোলেনি।

আমার ফেলে আসা সংসার নিয়ে কথা হয়.... কৃষক বলে মনে আছে আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম.......... ওর মনে হয়তো একটা কাঁটা খঁচখচ করে.... তাই আমি বলি তুমি এটা নিয়ে একদম গ্লানি বোধ করবে না। যা হবার ছিল তা হয়েছে...এখানে অভিশাপ এর কিছু নাই।

দুজন কথা বলছি, কৃষক একটু পর পর বলে কত বছর পর তোমার সাথে কথা তাইনা?
আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম........আচ্ছা আজকে যদি তোমার সাথে আমার দেখা হত কোন কফিশপে বা অন্য কোথাও.....তোমার কি অনুভূতি হত? তোমার কি আমার হাতটা ধরতে ইচ্ছা করতো? আমাকে চুমু খেতে ইচ্ছা করতো?
ওপাশে খানিক নীরবতা। বেশ বেকায়দায় ফেলে দিলাম মনে হয়। আমি এপাশে হাসছি।
উত্তর এল...না, তারপর বলল মনে হয় না।
আমি বললাম এটাই স্বাভাবিক। ও বলল কেন?
বললাম তুমি এখন একজনের স্বামী, একটা মানুষ দুজনকে একসাথে ভালোবাসতে

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:০৮

পারে না, তাই তোমার আমার হাত ধরতে ইচ্ছা করবে না।

আমি বলি আমার উপর তোমার অনেক রাগ? বলে .... আগে ছিল, এখন নাই। ... এখন নাই কেন?.... নাই কেমন করে যেন রাগ চলে গেছে। বলি.... কেন এখন আমি একা এজন্য এত মায়া?....বলে না না তা হবে কেন....এটার সাথে ওটার কোন সম্পর্ক নাই। রাগ আরো আগেই চলে গেছে।

থেকে থেকে কৃষক বলে....জীবনটা এমন নাও হতে পারতো। আবার হয়তো খানিক পর বলে সব দোষই তো ছিল আমার, আর সুস্থ হতেও অনেক সময় লেগেছিল প্রায় ৩ বছর, তুমি আর কি করবা। আবার বলে তুমি তো আমাকে ছেড়ে চলে গেলা, একবার সুযোগও দিলা না।

আমি বলি তুমি আমার কাছে কেন সত্য বলতা না, আমার চেয়ে আপন ক্যাম্পাসে তোমার আর কে ছিল? ও বলে তোমাকে হারানোর ভয়ে বলতাম না। তুমি বলেছিলা ওটা খেলে যেন তোমার কাছে আর না আসি। অথচ না খেয়ে তো পারতাম না। আমি বলি এটা আমাকে কেন বল নাই, কেন বন্ধুর মত অকপট হওনি কৃষক? তোমার অনেক ভার আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম, এটুকু নির্ভর কেন আমার উপর করনি? কৃষক বলল....তুমি তো বন্ধু হতে চাওনি কিষাণী....তুমি সাধারন কোন নারীর মত বলেছিলা... ওটা খেলে যেন তোমার কাছে আর না আসি!!!!!!! হা কপাল, আমি যা বললাম তাই তোমার কাছে বড় হল। কখন তোমার বন্ধু আমি ছিলাম না, আর আমি তো নারীই, অতি সাধারন বাঙ্গালী নারী............আমার কাছে আর কি অসাধারনত্ব তুমি চেয়েছিলে আমি জানিনা।

আরেক বার বলি সুস্থ যখন হলে তুমি তো জানতে আমি কোথায় আছি, তখন কেন এলেনা আমার সামনে? পাল্টা প্রশ্ন করলো ..আসলে কি হত? আমাকে গ্রহন করতা?...থমকে যাই আমি....একটু ভাবি...তারপর বলি...আমি জানিনা তখন গ্রহন করতাম কিনা, তবে জানতাম তো ভালো আছো...এখন এই যে স্বাভাবিক হয়ে কথা বলছি সেটা সেই অতটা বছর আগেই বলতাম.... আর যদি তখনো বিয়ে না হয়ে থাকতো, হয়তো বিয়েও করতাম..........আবেগ জড়িয়ে ধরে আমাদের ...বলি, ভালোবেসেছিলাম তোমাকে কৃষক... অনেক অনেক ভালোবেসেছিলাম....তুমি জানো সেটা। তারপর আবার স্বভাবিক হয়ে বলি....থাক, হয়তো বা যদি নিয়ে কথা বলে কি হবে। এখনকার কথা বল...। বলি বাদ দাও...সাথে সাথে উত্তর আসে বাদ দিলাম।

আবার বলি, তোমার সাথে সারারাত আমার পূর্ণিমা দেখার কথা ছিল, ..বলল মনে আছে, আমি কিছুই ভুলি নাই। আমি বললাম আজো আমার পূর্ণিমা দেখা হয়ে ওঠেনি....বুঝতে পারি ওপাশে মন খারপ হল। বলি ..জানো বিয়ের পর স্বামীকে বলেছিলাম আমার এই শখটার কথা...শুনে আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছিল... আমি বুঝে গেছিলাম এ জাতীয় কথা এখন আর বলা চলবেনা। আবার ওর মন খারাপ হল বুঝতে পারি... আবার টপিক চেইন্জ। এই কথাটা বলার সময়ও আমার চোখ ভরে এসেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেলে কেন? পড়াটা শেষ করলে না। আমার ওপর জেদ করেও তো পড়াটা শেষ করতে পারতা। ও বলল... সবাই বলেছিল প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়তে....আমি পড়িনি। কেন?...আমার একটা রাগ হয়েছিল...সাফল্যের প্রতি কোন মোহ ছিল না।.....আবার একসময় বলল..আমার মনে হত পাপ করেছি কিষাণী, আমার শাস্তি হওয়া দরকার,তাই ভাল কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়িনি,এখন যে কষ্টটা করবো তাই হবে পাপের শাস্তি।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:০৮

আমি শুনে আঁতকে উঠি...এসব কি বল, পাপ কেন হবে, তুমি ভুল করেছিলে, ভুল আর পাপ এক কথা হল? যে ভুল করেছিলা তার জন্য এমনি কত কষ্ট পেয়েছ, ডিগ্রি হল না, আমিও চলে গেলাম,আর কত শাস্তি হবে তোমার। আমার বুক ভেঙ্গে যায়। এই ছেলেটা এত আত্মনীপীড়ণ করতে পারে!!!!!! অসহ্য!!! তারপর বলি...তাতে কি, এখন তোমার সোনার সংসার, এখন তো ভাল আছ। বলে হ্যাঁ, এখন ভালো আছি।

আবার বলল....শেষ যেদিন তোমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার চোখে আমার জন্য কোন ভালবাসা দেখতে পাইনি কিষাণী, শুধু ঘৃনা ছিল, তাই আর তোমাকে খুঁজিনি। আমি বলি আমি তোমাকে ঘৃণা করবো? তোমাকে? আমি তোমাকে ভালবাসতাম!!!!! ছায়ার মত তোমার পাশে ছিলাম। বলল আমার তখন এমনই মনে হয়েছে, এবং সেটা ভুল ছিল না।

আবার বলছে ....কতদিন পর কথা বলছি, একদম সিনেমার মত!!!! আমি বললাম, না না মৈত্রেয়ী দেবীর "ন হণ্যতে" র মত। অনেক অনেক বছর আমরা পুরোনো দিনের কথা ভাবছি!!! কৃষক যখন বলে আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়, এমন তো না ও হতে পারতো, তখন খুব খারাপ লাগে কিষাণী, মানতে পারি না। কিংবা যখন বলে... তুমি সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতা, আমাকে দেখানোর জন্য, চারদিকে তোমার স্মৃতি, আমি আর থাকতেই পারলাম না ওখানে। তখন আমি পিসির সামনে বসে ঝরঝর করে কাঁদি তারপরও বলি বাহ, তোমার একারই শুধু কষ্ট হত, আমার হয়নি, আমি কেমন করে ছিলাম???? ও বলে আমি পারিনা কিষাণী, তুমি ছেড়ে গেছ আমি তো যাইনি, তোমার বলয় ছেড়ে বের হতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

তখন আমি আবার দুষ্টুমি জুড়ি, বিয়ে কিভাবে হল, প্রেম করে? বলে ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়, আমি গেছি দুবার। শুনে হাসতে হাসতে আমি খুন। বলি যাই বল তোমার নারী ভাগ্য ভাল...সুন্দরী মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়ে!! ও বলে ওরে কি বলে রে!!!

এরপর যেদিন কথা হল জিজ্ঞেস করলাম আমার সাথে কথা বলে তোমার কেমন লাগলো? উত্তরটা না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো তোমার কেমন লাগলো।... বেশ চালাক হয়ে গেছে কৃষক, ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখেছে। আমি বললাম কখনো খুব ভালো লেগেছে, কখনো আমি বুকের মধ্যে কষ্টের তীব্র ব্যথা টের পেয়েছি, কখনো ঝরঝর করে কেঁদেছি ....এমনি অনুভূতি ছিল আমার। এবার বলল... আমাদের সব কিছু তো একই রকম ছিল....এখন তো আলাদা অনুভূতি হবার কোন কারন নাই!!!!!!! ফাঁকিবাজ, এখানেও ফাকি দিল।

এরপর ব্লগে লেখা এই পর্বের লেখা গুলো পড়লাম, পড়তে পড়তে আবার স্মৃতির মাঝে হারিয়ে গেলাম....কৃষক আমাকে নিক আর পাসওয়ার্ড দিয়ে দিল, বলল তুমিও লেখ। সে থেকে কিষাণীর আগমন। কিছুদিন পর আমি বলতাম এ কিসের মধ্যে ফেলে দিলা.... এ পর্ব আমি কেমন করে শেষ করবো?....সে বলতো কৃষকের ব্লগ আমি তোমাকে দিয়া দিলাম, তুমি যেভাবে খুশি শেষ কর। কিছুদিন লেখার পর আর এগুতে পারিনা। তারপর লেখা বন্ধ ছিল। মনে হল শেষ করি, সবাই ভাবে আমরা সত্যিকার কৃষক-কিষাণী....এ খেলা সাঙ্গ করি। ঝড় তোলা সেই দিনগুলির মুখোমুখি হওয়া যে এখনো কত কঠিন!.........কতবার লিখতে লিখতে চোখ ঝাপসা হয়েছে.....।

এখনো আমাদের মেসেন্জারে কথা হয়..... হয়তো দেশে ফিরলে সময় সুযোগ হলে দেখা হবে....না হলেও ক্ষতি নেই। সেই দিনগুলি মনের মাঝে আছে সেই ভালো.....। কৃষকের বাকী জীবনটা সুখে কাটুক...।

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

০৮ ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ রাত ১২:০৮

আমাদের দুজনের মধ্যে এখন যে সম্পর্ক....এটা না প্রেম...... না ভালোবাসা,.... এটা একটা মায়া। তবে বন্ধুত্ব হয়তো আছে। একটা গান শুনেছিলাম উড়ে যায় বকপক্ষী; পড়ে থাকে মায়া.........এমন কিছু একটা। তাই ভালোবাসা, কামনা সব ধুয়ে গেছে, রয়ে গেছে মায়া। সময় এক অদ্ভুদ জিনিস...অনেক কঠিন ব্যাপারকে সহজ করে দেয়। সব কথা অবলীলায় তার সাথে এখন শেয়ার করি।কৃষক কোন ইন্টারফেয়ার করে না, চুপচাপ নিরবে,অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে শোনে। কখনো উপদেশ দেয়। মতের মিল না হলে আমি যখন তর্ক করি, যুক্তি দেখাই, তখন বলে তোমাকে তো কিছু বলে লাভ নাই, সব কিছুর মধ্যে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে দিবা, তোমাকে তো আমি চিনি!!! এই মায়ময় সম্পর্কটা হয়তো থাকবে.......দ্বিপাক্ষিক আগ্রহের উপর ভিত্তি করে। ভাল আছে, সুখে আছে, এটা জানাতেই সুখ, পরম শান্তি।

এই সিনেমার আরো নাটকীয় কোন মোড় হতে পারে ------আগামী ২০ বছর পর কৃষকের ছেলে আমার মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করছে, পটিয়ে ফেলেছে, তখন আমি ওর ছেলের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিব বলে হুমকি দিচ্ছি। আর কৃষকের বউ বলছে...এই মেয়েটার মা আমার স্বামীর মাথা খেয়েছে আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, এখন আমার সোনার ছেলেটার মাথা খাচ্ছে!!!!!!!!!! হাহাহাহা।

সমাপ্তি

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচা

২৩ শে জুলাই, ২০০৯ সকাল ১০:৪৯

কৃষক-কিষাণীর রোজনামচার আপডেট

কৃষকের সাথে অনেক বছর পর যখন কথা হল, সে সূত্রে অন্য পুরোনো বন্ধুদের খোঁজ খবরও পাওয়া গিয়েছিল। সেসব বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হল, একসময় গত ঈদে আমরা একটা আড্ডাও দিয়ে ফেললাম। কৃষককে বলেছিলাম তুমি দেশে এলে আমরা আরেকটা গেট টুগেদার করবো, এখন তো অনেকগুলো বন্ধুর খোঁজ জানি, সবাইকে ডাকবো। কৃষক আমার আগ্রহ এবং আনন্দে একদম ঠান্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে জানালো..... "কোন দরকার নেই, আমি এখন পুরাপুরি ভার্চুয়াল, বাস্তব জগতে আমাকে আর পাওয়া যাবে না। তোমার গেট টুগেদার তুমিই করো।"

মেজাজ চরম গরম হলেও কিছু বলি নাই। যা খুশি করুক, তার ভার্চুয়াল থাকতে ভাল লাগলে আমার কি! আবার ঠিকই খবর নিবে কেমন আড্ডা হল, কে কোথায় কেমন আছে, কার বাচ্চা কাচ্চা কয়টা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর মধ্যে আমি বেশ ব্যস্তই আছি বলা চলে। তারপরও এক বৈদেশ ফেরত বন্ধুর উছিলায় আমরা আবার একখানা জটলা করার সুযোগ পেলাম। আগে ভাগে কৃষককে জানালামও সে কথা। আড্ডার দিন পুরোনো বন্ধুরা সব পুরোনো দিনের গল্প করছে......... ভার্সিটি লাইফের ফাঁকিবাজির কথা শুনতে যেয়ে হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে আসছিল, এত সাধের কাজল গেল মুছে। যাক গে কাজল, এত মজার সময় তো আর পাওয়া যাবে না। আমার ভার্সিটির গল্প বলতে গেলে তো অবধারিত ভাবে কৃষক এর কথা চলে আসে........আমি বলছিলাম আমার ফাঁকিবাজির গুরু হল কৃষক, আমরা কি কি ফাঁকি দিতাম...... (অবশ্য সেদিন কৃষক মেসেন্জারে বলছিল সে নাকি সারাজীবন আমার বুদ্ধিতে চলতো, আমার অবাক হওয়া ছাড়া আর কি করার আছে!) আমাদের বন্ধুরা ১২-১৪ বছর পর দেখা, আমাদের সম্পর্কের ভাঙ্গনের পর এই প্রথম কৃষকের নাম আমার মুখে ওরা শুনলো, অথবা নিজেরাও বলল; ওরা হয়তো একটু অবাকই হল।

আড্ডা চলার সময় কৃষককে এসএমএস করেছিলাম, কোন মুল্লুকে ছিল কে জানে, কোন রেসপন্স নাই। খাওয়া দাওয়ার পর সবাইকে আমাদের (কৃষক-কিষানীর) পুনরায় যোগাযোগের গল্পটা বললাম। সবাই অতীব আগ্রহের সাথে, পিনপতন নিরবতার মধ্য দিয়ে ঘটনাটা শুনলো। একবার মনে হচ্ছিল ব্লগে লেখা আমাদের মহাকাব্যটার কথাও বলে দিই। পরে ভাবলাম এটা তো আমার একার সম্পত্তি নয়, কৃষকের অনুমতি ছাড়া এটা কাউকে বলা ঠিক হবে না।

ফিরে এসে ছবিগুলো পিসিতে নেয়ার সময় দেখি কৃষক অনলাইনে আছে। তার সাথে আড্ডার গল্প এবং ছবিগুলো শেয়ার করলাম। সে দেখি কাউকেই চিনতে পারে না। বলে কোনটা কে বলে দাও। আমাকে বলল, আমি নাকি মটু হয়ে গেছি। আবার বলে লম্বা চুলগুলা কেটে ফেললাম কেন? আমি বলি সব সময় এক ফ্যাশন ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে চেইন্জ করতে হয়। আমি বললাম সবাইকে অনেক কথা বলে দিয়েছি তবে ব্লগের কথা বলি নাই। আমাকে ফোড়ন কাটলো, আমি ভয় পেয়েছি কিনা। এই অপবাদের উচিৎ জবাব কিভাবে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

এরপর দিন কৃষক নাকি স্বপ্ন দেখেছে, কক্সবাজার সমূদ্র সৈকতে সে আমার সাথে ঘুরতে গেছে। এইটা বলার জন্য ফোন পর্যন্ত করলো। আমি বলি ঘুরতে গেলা আর কি করলা? বলে সেইটা বলা যাবে না। (লজ্জায় লাল হবার ইমো হবে)।

(অনেক দিন কোন পোস্ট দেয়া হয় না..........তাই কৃষক-কিষাণীর জীবন যাপনের একটু আপডেট দিলাম.......... কিষাণী)

কৃতজ্ঞতাঃ সামহয়ারইন ব্লগ

www.somewhereinblog.net